Semester-5, DSE-1

কঠোপনিষদের শান্তিপাঠ শ্লোকের ব্যাখ্যা

কঠোপনিষদের প্রারম্ভে রয়েছে শান্তিপাঠ। এখানে যে ভাবটি রয়েছে সেটি হল গুরুশিষ্যের ভাব। শান্তিপাঠের উক্তি যদিও আচার্য অর্থাৎ গুরুর উক্তি কিন্তু এটি গুরু-শিষ্য দুই-এর জন্যই।

শান্তিপাঠে ব্রহ্মের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে তিনি যেন ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশের দ্বারা গুরু এবং শিষ্য উভয়কেই সর্বতোভাবে রক্ষা করেন। গুরু এবং শিষ্য উভয়েই সেই পরম ব্রহ্মের দ্বারা সম্ভক্ত এই আবেশে উভয়কে আবিষ্ট করেন এবং ব্রহ্মবিদ্যার ফল যে পরমানন্দ সেই আনন্দ অমৃতে তাঁদের তৃপ্ত করেন। তাঁরা উভয়েই যেন আত্মজ্ঞানরূপ শক্তির দ্বারা শক্তিমান, বীর্যবান হন এবং তাঁদের অধীত এই বিদ্যা যেন কখন নিষ্প্রভ না হয়, তার তাৎপর্য যেন তাঁরা উভয়ে সমানভাবে ধরতে পারেন। তাঁরা যেন পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন না হন। গুরু যেন শিষ্যের অনবর্বমতার জন্যে বিরক্ত না হন এবং শিষ্যো যেন গুরুর ত্রুটির জন্য তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাহীন না হন।

এই গ্রন্থ পাঠের উদ্দেশ্য সত্যকে জানা। গুরু-শিষ্য উভয়ে মিলিতভাবে এই সত্যকে জানার চেষ্টা করবেন এবং তা জেনে উভয়ে কৃতকৃতার্থ বোধ করবেন।

শান্তি পাঠের শেষে তিনবার শান্তি মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে আত্মজ্ঞান লাভের পথে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে।

এই তিনপ্রকার বিঘ্ন যাতে জ্ঞান লাভের প্রতিবন্ধক না হয় সেহেতু তিনবার শান্তি বলা হয়ছে।

Semester-5, DSE-1

'মৃত্যবেত্বা দদামীতি'- প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক কঠোপনিষদের শ্লোকের ব্যাখ্যা

কঠ উপনিষদে সমস্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞান একটি আখ্যায়িকা দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। সেখানে উল্লিখিত আছে বাজশ্রবস নামে এক ঋষি ছিলেন। তিনি বিশ্বকে জয় করার উদ্দেশ্যে বিশ্বজিৎ নামে এক যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন। সূর্যই বিশ্বজিৎ। এই যজ্ঞ সম্পাদনের মাধ্যমে তিনি সূর্যের মত হতে চেয়েছিলেন। নিজের যথাসর্বস্ব দান করাই ছিল এই যজ্ঞের নিয়ম।

কিন্তু বাজশ্রবস ছিলেন সকাম সাধক। তাঁর ভেতরে সম্ভোগের ভাবটি থেকে গিয়েছিল। তিনি যজ্ঞে ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দেবার জন্য এমন কতগুলি গাভী এনেছিলেন যেগুলি বৃদ্ধ ও দূর্বল। দাতা এবং গ্রহীতা দু-এর পক্ষেই যা অসার সেই রকম বস্তু পিতাকে দান করতে দেখে নচিকেতা তাঁর পিতার ভবিষ্যৎ ভেবে ভীত ও চিন্তিত হয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল এরকম শ্রদ্ধাহীন কাজের মাশুল রূপে মৃত্যুর পর তাঁর পিতাকে আনন্দহীন লোকে যেতে হবে।

নচিকেতা ছিলেন এক অসামান্য প্রকৃতির বালক। শাস্ত্রের প্রতি তাঁর ছিল প্রগাদ শ্রদ্ধা। পিতাকে দানের মূল নীতি স্মরণ করিয়ে দেওয়া তাঁর কর্তব্য বলে তিনি মনে করেছিলেন। বিশ্বজিৎ যজ্ঞের বিধি যেহেতু সর্বস্ব

দান এবং পুত্র যেহেতু সর্বস্বের অন্তর্ভুক্ত সেহেতু তাকে দান করা ও তাঁর পিতার কর্তব্য বলে তিনি মনে করেছিলেন। যজ্ঞের পূর্ণতা সম্পাদান এবং পিতার অনিষ্ট নিবারণের উদ্দেশ্যে পিতাকে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন পিতা তাঁকে কোন্ ঋষির নিকট দান করছেন। পিতার কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে তিনি একই প্রশ্ন তিনবার করেছিলেন। তখন পিতা ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে উত্তর দিয়েছিলেন 'মৃত্যবেত্বা দদামীতি' অর্থাৎ 'তোমাকে যমের উদ্দেশে দান করলাম'। পিতার এই কথা অবশ্যই বিরক্তিসূচক মুখের কথামাত্র ছিল কারণ কোন পিতা নিজ পুত্রকে যমকে দেন না। এটি ছিল

পিতার ক্রোধের বহিপ্রকাশ। কিন্তু নচিকেতা এই পিতৃবাক্যকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করে পিতৃমত্য রক্ষার জন্য যমালয়ে গমন করেন।

Semester-5, DSE-1

পিতার যে আচরণে নচিকেতা ব্যথিত হয়েছিল প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক তার আলোচনা

কঠ উপনিষদের সমস্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞান একটি আখ্যায়িকা দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। সেখানে উল্লিখিত আছে নচিকেতার পিতা বাজশ্রবস বিশ্বকে জয় করার উদ্দেশ্যে বিশ্বজিৎ নামক একটি যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন। সূর্যই বিশ্বজিৎ। এই যজ্ঞ সম্পাদনের মাধ্যমে বাজশ্রবস সূর্যের সঙ্গে একাত্ম হতে চেয়েছিলেন। নিজের যথাসর্বস্ব দান করাই ছিল সেই যজ্ঞের বিধি।

কিন্তু বাজশ্রবস ছিলেন সকাম সাধক। তাঁর অন্তরে সম্ভোগের ভাবটি থেকে গিয়েছিল। তিনি যজ্ঞের বিধি পালনের জন্য কেবল ও অসার বস্তুগুলি দান করছিলেন। তিনি পুরোহিতের দক্ষিণাস্বরূপ যে গাভীগুলি দান করবেন বলে ঠিক করেছিলেন সেগুলি ছিল জরাজীর্ণ ও অসার। সেগুলি এত বৃদ্ধ ও দুর্বল ছিল যে তাদের দেখে মনে হচ্ছিল তারা জন্মের মতো জলপান করেছে, আর করবে না। জন্মের মতো তৃণভোজন করেছে আর করবে না। দুর্ব যা দেবার তা দিয়ে শেষ করেছে। তারা ইন্দ্রিয়শক্তিহীন ও সন্তান উৎপাদনে অসমর্থ।

পিতার এই ত্রুটিপূর্ণ যজ্ঞনুষ্ঠান নচিকেতাকে ব্যথিত করেছিল। নচিকেতা বয়েসে তরুণ হলেও এক অসামান্য প্রকৃতির বালক ছিলেন। তিনি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন এবং শাস্ত্রে তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। সেই শ্রদ্ধার আলোকে তিনি বুঝেছিলেন, যজ্ঞ যদি করতে হয় তাহলে যেমন যেমন বিধান আছে তদনুসারে করা উচিৎ। বিশ্বজিৎ যজ্ঞের বিধি অনুযায়ী যজমানকে সর্বস্ব দান করতে হয়। কিন্তু তাঁর পিতা দাতা ও গ্রহীতা দু-এর পক্ষেই যা অসার শুধু সেরকম বস্তুই দান করছিলেন। এই শ্রদ্ধাহীন কাজের মাশুল যে তাঁর পিতাকে ভবিষ্যতে দিতে হবে সে কথা মনে করে নচিকেতা ভীত ও চিন্তিত হয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল এরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ শ্রদ্ধাহীন দানে তাঁর পিতার স্বর্গলাভ তো হবেই না বরং মৃত্যুর পর তিনি আনন্দহীন লোকে যাবেন। এই ভাবনা নচিকেতাকে ব্যথিত করেছিল।

Semester-5, DSE-1

যম কর্তৃক নচিকেতাকে প্রদত্ত প্রথম বরের তাৎপর্য

কঠোপনিষদে কথিত আছে নচিকেতার পিতা বাজশ্রবস বিশ্বজিৎ নামক একটি যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। এই যজ্ঞের বিধি যেহেতু নিজের সর্বস্ব দান, সেহেতু নচিকেতা তার পিতাকে প্রশ্ন করেন পিতা তাকে কার কাছে অর্পন করছেন কারণ পুত্র নচিকেতা ও পিতার সম্পত্তির অঙ্গ। বারবার নচিকেতার একই প্রশ্নে বিরক্ত হয়ে বাজশ্রবসবলেন তিনি তাকে যমের উদ্দেশ্যে অর্পন করছেন। পিতৃবাক্যকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করে নচিকেতা যমালয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ঘটনাচক্রে নচিকেতা যখন যমালয়ে পৌঁছান সেই সময় যমরাজ বাড়িতে ছিলেন না। যমরাজের অনুপস্থিতির কারণে নচিকেতা সেখানে তিনদিন উপবাসে কাটান। যমালয়ে ফিরে ব্রাহ্মণ অতিথির তিনদিন উপবাসী থাকার খবর শুনে যমরাজ অমঙ্গল আশঙ্কায় বিচলিত হন এবং নচিকেতাকে সন্তুষ্ট করতে তৎপর হন। গৃহস্বামী হিসাবে নিজের ত্রুটি সংশোধনের জন্য তিনি নচিকেতাকে তিনটি বর দিতে চান, যেহেতু নচিকেতা তার গৃহে তিনদিন তিনরাত্রি উপবাসে কাটিয়েছে।

প্রথম বরে নচিকেতা যমরাজের কাছে তার পিতার মানসিক শান্তি, প্রসন্নতা ও তাঁদের পুনর্মিলন যাতে শান্তিতে হয় তা প্রার্থনা করেন। তিনি যমরাজকে অনুরোধ করেন তাঁর পিতা যেন দুশ্চিন্তামুক্ত ও প্রসন্নচিত্ত হন। নচিকেতার প্রতি তাঁর যেন আর রাগ না থাকে। নচিকেতা যমালয় থেকে স্বগৃহে ফিরে গেলে পিতা যেন তাকে ততক্ষণাৎ চিনতে পারেন এবং পূর্বের মতোই তাকে সাদরে গ্রহণ করেন।

যমরাজ নচিকেতার এই প্রার্থনা মঞ্জুর করে উত্তরে জানান, নচিকেতা যমালয় থেকে যমরাজের নির্দেশে গৃহে ফিরে যাবার পরেও তার প্রতি তার পিতার স্নেহ ভালবাসার কোন ঘাটতি হবে না। তার পিতা উৎকণ্ঠা হয়ে সুখনিদ্রায় রাত কাটাবেন। এবং নচিকেতাকে যমের দুয়ার থেকে ফিরে যেতে দেখে তাঁর রাগ প্রশমিত হবে এবং তিনি প্রসন্নতা লাভ করবেন।

নচিকেতার এই প্রথম বর প্রার্থনার মধ্য দিয়ে পিতার প্রতি তার ভালোবাসা এবং পিতৃভক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। নচিকেতা জানতেন যে, পিতা তাকে সত্যি সত্যিই যমের কাছে পাঠাতে চান নি। নচিকেতার আচরণে বিরক্ত হয়ে তিনি রেগে একথা বলেছিলেন এবং সেই কারণে হয়তো তিনি অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হচ্ছেন। তাই নচিকেতা প্রথমেই যমের কাছে তার পিতার মানসিক শান্তি ও প্রসন্নতা প্রার্থনা করেছিলেন। স্বগৃহে ফিরে গেলে তিনি পিতার কাছ থেকে কিরূপ অভ্যর্থনা পাবেন সে বিষয়ে শঙ্কিত ছিলেন। তাই তিনি তার প্রথম বরে যমরাজের কাছ থেকে এই আশ্বাস ও প্রার্থনা করেছেন যাতে তার পিতা তাকে পূর্বের মতই সস্নেহ সম্ভাষণে গ্রহণ করেন। যম কর্তৃক নচিকেতাকে প্রদত্ত প্রথম বরটি বিচার করলে বোঝা যায় যে কোন সাধারণ মানুষের মত নচিকেতা তার প্রথম বরে ইহলোকের সুখ কামনা করেছেন। এবং যমরাজও তাকে সেই বর প্রদান করেছেন যাতে তার গৃহেশান্তি হয়। তার পিতা তকে ফিরে পেয়ে আনন্দিত চিত্তে সাদরে গ্রহণ করেন।

যমরাজ কর্তৃক নচিকেতার নিকট অগ্নিবিদ্যা ও অগ্নির স্বরূপ ব্যাখ্যা

অগ্নিবিদ্যা হল স্বর্গলাভের উপায়। নচিকেতা স্বর্গলাভের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ পারলৌকিক সুখ কামনায় দ্বিতীয় বর হিসাবে যমরাজের নিকট অগ্নিবিদ্যা বিস্তারিতভাবে জানতে চান কারণ তার মনে হয় অগ্নিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার পক্ষে যমই সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি, যেহেতু তিনি নিজে এই অগ্নিবিদ্যা অভ্যাসের দ্বারা স্বর্গলোকে দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন।

অগ্নির স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে যমরাজ নচিকেতাকে বলেন, অগ্নি স্বর্গপ্রাপ্তির উপায় ও জগতের আশ্রয়স্বরূপ। তিনি না থাকলে জগৎ নিরাধার। ব্রহ্মের প্রথম প্রকাশ হল অগ্নি। এই অবস্থায় ব্রহ্ম মায়ার সঙ্গে যুক্ত অর্থাৎ সগুন। বিরাট, হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বর, প্রজাপতি, ব্রহ্মা প্রভৃতি নামেও অগ্নিকে অভিহিত করা হয়ে থাকে। প্রতিটি নাম জগতের সূচনাকেই চিহ্নিত করে। জগতের প্রথম অভিব্যক্ত রূপ হলেন হিরণ্যগর্ভ এবং হিরণ্যগর্ভের পরে স্থূলীভূত সমষ্টিরূপ হলেন বিরাট।

অগ্নির অভিমানিনী দেবতা বিরাটের কৃপায় স্বর্গলোক প্রাপ্তি হয়। সাধকের জ্যোতির্ময় প্রকাশমান কর্তব্য সর্বজ্ঞ, হিরণ্যগর্ভ থেকে জাত বিরাট এর বিষয়ে শিক্ষা লাভ করা। তাঁকে জেনে, তাঁর সঙ্গে অভিন্নভাব প্রাপ্ত হয়ে সাধকের স্বর্গলাভ হয়। হিন্দু শাস্ত্রে কথিত আছে উপাসক যাঁর উপাসনা করেন তাঁর সঙ্গে অর্থাৎ উপাস্যের সঙ্গে এক হয়ে যান। অগ্নির উপাসনার মধ্যে দিয়েও সাধক অগ্নির সঙ্গে, বিরাটের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করেন। জগতের সার স্বরূপের সঙ্গে মিশে গিয়ে সাধক অমরত্ব লাভ করেন। এই কারনেই কঠ উপনিষদে যম নচিকেতাকে বলেছেন অগ্নি উপাসনার দ্বারা মানুষ মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে গিয়ে অমৃতত্ব লাভ করে।

অগ্নির মাধ্যমে বিরাটের সঙ্গে একাত্মতা উপলব্ধি করে সাধক পরা শান্তি লাভ করেন এবং মোক্ষলাভের পথে এগিয়ে যান। অগ্নি যজমানকে গভীর ধ্যানে মগ্ন করে যার ফল স্বরূপ যজমান বিরাটের সঙ্গে মিলিত হন – এখানে অগ্নির মূল্য। কঠোপনিষদে 'অগ্নি' বলতে কখনও বিরাটকে বোঝান হয়েছে আবার কখনও সেই যজ্ঞকে বোঝান হয়েছে যা বিরাটের সঙ্গে যজমানকে একাকার করে দেয়। যখন 'অগ্নি' বলতে বিরাটকে বোঝান হয়েছে তখন তিনি হলেন উদ্দেশ্য যাঁর সঙ্গে সাধক একাত্মতা উপলব্ধি করতে চান, আর যখন 'অগ্নি' বলতে যজ্ঞ কে বোঝান হয়েছে তখন, সেই যজ্ঞ হল উপায় যার মাধ্যমে সাধক বিরাটের সঙ্গে একাত্ম হন।

অগ্নিযজ্ঞ বিষয়ে যমরাজের উপদেশ

যমরাজের অনুপস্থিতিতে নচিকেতা যমালয়ে তিনদিন তিনরাত্রি উপাবাসে কাটান। গৃহস্বামী হিসাবে ব্রাহ্মণ অতিথি আপ্যায়নের এই ত্রুটি স্খলনের জন্যে যমরাজ নচিকেতাকে তিনটি বর দেবেন বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। নচিকেতা দ্বিতীয় বরে যমরাজের নিকট স্বর্গলাভের উপায় স্বরূপ অগ্নিবিদ্যা প্রার্থনা করেন।

যমরাজ নচিকেতাকে অগ্নিবিদ্যাকে বিষয়ে উপদেশ প্রসঙ্গেঁ বলেন, অগ্নি হল সর্বভূতের অন্তরাত্মা। এই কারণে অগ্নিকে বলা হয় জগতের আশ্রয়। ব্রহ্মের প্রথম প্রকাশ হলেন অগ্নি। বিরাট, হিরণ্যগর্ভ, প্রজাপতি, ব্রহ্মা প্রভৃতি নামেও এই অগ্নিকে অভিহিত করা হয়। জগতের প্রথম অভিব্যক্ত রূপ হলেন হিরণ্যগর্ভ এবং হিরণ্যগর্ভের পরে স্থূলীভূত সমষ্টিরূপ হলেন বিরাট। কেমনভাবে এই অগ্নি যজ্ঞ সম্পাদন করতে হয় সে বিষয়ে উপদেশ দানকালে যমরাজ নচিকেতাকে যজ্ঞবেদী নির্মানের পদ্ধতি বিষয়ে উপদেশ দেন। কি ধরণের এবং কত সংখ্যক ইট এই বেদী তৈরীতে লাগবে, সেগুলি কিভাবে বিন্যস্ত করতে হবে, যজ্ঞের আগুন কিভাবে জ্বালাতে হবে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে তার বিবরণ দেন। তিনি নচিকেতাকে বলেন মাতা, পিতা এবং আচার্যের দ্বারা উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করে যে ব্যক্তি তিনবার এই অগ্নি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠান, দান ও বেদ অধ্যয়ন এই তিনটি বিষয় অভ্যাস করেন তিনি জন্মমৃত্যুর পারে যান অর্থাৎ তার স্বর্গলোক প্রাপ্তি হয়।

যমরাজ নচিকেতাকে আরো বলেন যজ্ঞে ব্যবহার্য ইষ্টকের স্বরূপ, সংখ্যা অগ্নিচয়নবিধি, কিভাবে যজ্ঞটি করতে হয়, যজ্ঞে কি কি বস্তুর উপযোগ করতে হয় ও কেমনভাবে করতে হয় সব জেনে যিনি তিনবার অগ্নিযজ্ঞ সম্পাদন করেন তিনি শরীর ত্যাগের পূর্বেই মৃত্যুর পাশ থেকে অর্থাৎ অধর্ম, অজ্ঞান, রাগদ্বেষ, আসক্তি রূপ বন্ধন থেকে মুক্ত হন এবং শোকাতীত হয়ে, সকলপ্রকার মনঃকষ্ট বর্জিত হয়ে স্বর্গলোকে আনন্দ উপভোগ করেন।

স্বর্গসাধন অগ্নিবিদ্যা বিষয়ে নচিকেতাকে উপদেশ দানের পর যমরাজ নচিকেতার অসামান্য মেধার পরিচয় পেয়ে তাকে চতুর্থ একটি বরদান করে বলেন অগ্নিযজ্ঞের অগ্নিকে সকলে অতঃপর নচিকেতার নামে অভিহিত করবে।

Semester-5, DSE-1

যমরাজ কর্তৃক নচিকেতার আত্মজ্ঞান লাভের যোগ্যতা পরীক্ষা

যমালয়ে যমরাজের অনুপস্থিতির কারণে নচিকেতা তিনদিন তিনরাত্রি উপবাসে কাটান। যমালয়ে প্রত্যাগমনের পর যমরাজ এই সংবাদ পেয়ে বিচলিত হন এবং গৃহস্বামী হিসেবে ব্রাহ্মণ অতিথি সৎকারের এই ত্রুটী সংশোধনের জন্য তিনি নচিকেতাকে তিনটি বর দিতে চান। তৃতীয় বরে নচিকেতা যমরাজের কাছে আত্মার স্বরূপ জানতে চান। মৃত্যু কি মানুষের জীবনের শেষ কথা, নাকি পরিবর্তন মাত্র, মৃত্যুর পরে আত্মার কোন অস্তিত্ব আছে কিনা- এই ছিল নচিকেতার জিজ্ঞাস্য।

নচিকেতার জিজ্ঞাসার উত্তরে যমরাজ বলেন আত্মতত্ত্ব বিষয়ে দেবতারা ও সন্দিহান এবং বাস্তবিক এই তত্ত্ব অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও দুর্বিজ্ঞেয়। প্রত্যক্ষাদি কোন প্রমাণের দ্বারা এই তত্ত্বকে জানা যায় না। মন-বুদ্ধি দ্বারা বিচার করেও এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। আত্মজ্ঞানের পথ ক্ষুরের অগ্রভাগের মতোই তীক্ষ্ণ ও দুর্গম। এই তত্ত্বকে আয়ত্ত করা অত্যন্ত কঠিন।সুতরাং যমরাজ বলেন নচিকেতা যেন যমরাজের কাছে আত্মতত্ত্ব ভিন্ন অন্য কোন বর প্রার্থনা করেন। এই কথা বলে যমরাজ প্রথমে নচিকেতাকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করেন। তিনি পরীক্ষা করে দেখে নিতে চান নচিকেতার মন আত্মজ্ঞান লাভের জন্য প্রস্তুত কিনা, নচিকেতা আত্মজ্ঞান লাভের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত কিনা, তিনি আত্মজ্ঞান লাভের যোগ্য অধিকারী কিনা।

যমরাজের এরূপ কথায় বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে নিজের লক্ষ্য থেকে সরে না গিয়ে নচিকেতা বলেন অন্য কোন বর এই আত্মজ্ঞানের তুল্য হতে পারে না এবং মৃত্যুর অধিপতি যমকেই তিনি এবিষয়ে জ্ঞানদানের যোগ্যতম ব্যক্তি বলে মনে করেন।

নচিকেতাকে কোনভাবে নিরুৎসাহিত করতে না পেরে এরপর যমরাজ তাকে নানা প্রভোলনের প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেন। তিনি নচিকেতাকে বলেন নচিকেতা তাঁর কাছে শতবর্ষ পরমায়ু বিশিষ্ট পুত্র পৌত্রাদি, বহু সংখ্যক গবাদি পশু, হাতি ঘোড়া,বিপুল পরিমাণ স্বর্ণসম্পদ প্রার্থনা করতে পারেন। সুস্থ সবল শরীরে যতদিন ইচ্ছা পরমায়ু তিনি চাইতে পারেন। এর তুল্য অন্য কোন বর প্রার্থনীয় মনে করলে তাও চাইতে পারেন। দেবতা ও মানুষের ভোগ্য যা কিছু কামনার বস্তু আছে নচিকেতা চাইলেই তা পেতে পারেন। এইসব ভোগ্য বস্তু যাতে নচিকেতা নির্বিঘ্নে ভোগকরতে পারেন সেই আশ্বাসও যম তাকে দেন।

প্রকৃত আচার্যের মত শিষ্যের যোগ্যতা যাচাই এর উদ্দেশ্যে যমরাজ তাকে আরো প্রলোভিত করেন। তিনি বলেন, যে সব কাম্য বস্তু মনুষ্যলোকে দুর্লভ নচিকেতা চাইলে সেগুলিও পেতে পারেন। যেমন, তিনি চাইলে রথে উপবিষ্টা বিনা বাদবরতা অপ্সরাদের দিয়ে তিনি তার পরিচর্যা করাতে পারেন।

উক্ত প্রলোভন সমূহের মধ্যে দিয়ে যমরাজ নচিকেতাকে যাচাই করে দেখেছেন অধিকাংশ সাধারণ মানুষের কাছে যা অত্যন্ত লোভনীয় এবং দুষ্প্রাপ্য তা নচিকেতাকে প্রলুব্ধ করছে কিনা। কিন্তু নচিকেতা নিত্য-অনিত্য বস্তু বিচারের দ্বারা সমস্ত অনিত্য বস্তুকে উপেক্ষা করে আত্মজ্ঞানকেই তার একমাত্র কাম্য বস্তু যমরাজ তাকে দিতে চাইছেন সেগুলি ক্ষণস্থায়ী, উপরন্তু তা ইন্দ্রিয়ের শক্তিকে ক্ষয় করে। এবং যে দীর্ঘজীবন যমরাজ

তাকে দিতে চাইছেন অনন্তকালের তুলনায় তা নিতান্তই স্বল্প। সুতরাং যা নিত্য যা চিরন্তন যা শাশ্বত একমাত্র সেই আত্মজ্ঞান লাভ করাই তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

Semester-5, DSE-1

প্রেয় অপেক্ষা শ্রেয় কেন শ্রেষ্ঠ

আত্মজ্ঞান লাভে পূর্বশর্ত হল প্রেয়কে পরিত্যাগ করে শ্রেয়কে সর্বান্তঃকরণে বরণ। সেই কারনে যমরাজ নচিকেতাকে আত্মতত্ত্ব বিষয়ে উপদেশ দানের পূর্বে শ্রেয় এবং প্রেয়- এ দুএর মধ্যে পার্থক্য বিষয়ে উপদেশ দান করেছেন। তিনি বলেছেন জগতে দুটি বিষয়ে মানুষের আকাঙ্ক্ষা থাকে - একটি শ্রেয় এবং অপরটি প্রেয়। শ্রেয় অর্থাৎ পরম কল্যাণময় আত্মজ্ঞান প্রেয় অর্থাৎ আপাত সুখকর বস্তু যেমন পুত্রবিত্তাদি থেকে ভিন্ন। এরা উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনে মানুষকে বদ্ধ করে এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনে সিদ্ধ করে। শ্রেয়ের প্রয়োজন মুক্তি লাভ এবং প্রয়ের প্রয়োজন অভ্যুদয় লাভ। এরা উভয়েই মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করে। উভয়ের মধ্যে যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন তাঁর কল্যাণ হয় কারণ মানব জীবনের পরম পুরষার্থ হল মোক্ষপ্রাপ্তি। আত্মাকে জানলে তবেই মোক্ষলাভ সম্ভব। আর যিনি প্রেয়কে বরণ করেন তিনি পরমার্থ অর্থাৎ জীবনের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হন। প্রেয়ের অন্বেষণ আপাত সুখ দিলেও জীবনের সার্থকতা দিতে পারে না। অভ্যুদয়ের সাধন অপরাবিদ্যাকে অর্থাৎ প্রেয়কে পরিত্যাগ করে যিনি নিঃশ্রেয়স সাধন ব্রহ্মবিদ্যাকে গ্রহণ করেন তিনি মোক্ষলাভের মাধ্যমে চিরন্তন শান্তি ও আনন্দ লাভ করেন।

শ্রেয় এবং প্রেয় পরস্পর মিশ্রিত হয়ে মানুষের কাছে উপস্থিত হয়। কিন্তু এই আপাত মিশ্রণের ভেতর থেকে সাধারণ মানুষ শ্রেয়কে প্রেয় থেকে আলাদা করতে পারে না কারণ তাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নয়, তা বাসনার দ্বারা কুলষিত। এহেন অদূরদর্শীপরম কল্যাণের পথ ছেড়ে প্রেয় অর্থাৎ আপাত সুখপ্রদ বস্তুকে গ্রহণ করে যোগ অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষিতবস্তুর প্রাপ্তি এবং ক্ষেম অর্থাৎ প্রাপ্ত বস্তু রক্ষণের জন্য এরা ইন্দ্রিয় সুখের প্রতি আসক্ত কারণ এই সুখ আপাতমধুর চিত্তাকর্ষক ও সহজলভ্য। এই শ্রেণীর মানুষেরা অবিবেকী, তার শ্রেয় এবং প্রেয়কে পৃথক করতে পারে না বলে শ্রেয়ের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে প্রেয়কে বরণ করে নেয়।

কিন্তু যারা ধীমান, বিচারশীল, বিবেকী ব্যক্তি তাঁরা প্রেয় ও শ্রেয়কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে অনিত্য সুখ ও নিত্য সুখকে পৃথক করে নিয়ে প্রেয় থেকে শ্রেয়কেই শ্রেষ্ঠ বলে বরণ করে নেন। তাঁরা জানেন প্রেয় অর্থাৎ যা আপাত মধুর তা ক্ষণস্থায়ী। তাঁরা একমাত্র নিত্য বস্তুকেইপেতে চান। তাঁরা জানেন একমাত্র শ্রেয়ের পথেই চিরস্থায়ী শান্তি ও আনন্দ লাভ করা যায়। এই পথই মানুষকে চরম লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। স্থূল ইন্দ্রিয় সুখে এই শ্রেণীর মানুষদের কোন আগ্রহ থাকে না কারণ তা ক্ষণস্থায়ী। তাঁরা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী হতে চান কারণ এই সম্পদ নিত্য ও শাশ্বত। শ্রেয়ের পথ অনুসরণ করে তাঁরা আত্মজ্ঞান লাভের মাধ্যমে পরা শান্তির অধিকারী হন। বিবেক বৈরাগ্য এবং আত্মসংযম অভ্যাসের দ্বারাই এই জ্ঞান অর্জন করতে হয়।

সাধারণ মানুষ ভোগে মগ্ন হয়ে থেকে ক্লেশ পায়। মৃত্যুগ্রস্ত হয়। এখানে মৃত্যু বলতে অজ্ঞানরূপ মৃত্যুকে বোঝান হয়েছে। অবিদ্যা, কাম, কর্ম হল অজ্ঞান। অজ্ঞান থেকে আসে বাসনা এবং বাসনার জন্যে হয় প্রবৃত্তি।

এর ভিতরে নিমজ্জিত হয়ে মানুষ আত্মাকে বিস্মৃত হয়ে থাকে এবং শাস্ত্রে বলা হয়েছে আত্মাকে ভুলে থাকার নামই মৃত্যু। অর্থাৎ বেশির ভাগ মানুষ প্রেয়ের পথ অনুসরণ করে না জেনে মৃত্যুর পথে চলেছে।

প্রেয় হল অবিদ্যা যা শুধু ইন্দ্রিয়সুখের সন্ধান দেয়। শ্রেয় হল বিদ্যা যা মানুষকে পূর্ণতায় পৌঁছে দেয়। দুটি বিষয় সম্পূর্ণ আলাদা এবং এদের ফল ও পৃথক। বিদ্যা কথাটির অর্থ হল জ্ঞান। জ্ঞান বলতে এখানে আত্মজ্ঞানকে বোঝান হয়েছে। আত্মজ্ঞানের দ্বারা মানুষ মুক্তি লাভ করে। অবিদ্যা ঠিক এর বিপরীত। এই অবস্থায় মানুষ কামনাবাসনার দ্বারা তাড়িত হয়ে ইন্দ্রিয় সুখের পেছনে ছোটে। কিন্তু যিনি বিষয়ানন্দকে জীবনের সব বলে মনে করেন তিনি ব্রহ্মানন্দ লাভ করতে পারেন না। আধ্যাত্মিক আনন্দ এবং পার্থিব সুখ – দুটি একসঙ্গে লাভ করা যায় না। শ্রেয়কে পেতে হলে প্রেয়কে ত্যাগ হয়। আত্মজ্ঞান লাভের এটি পূর্বশর্ত।

Semester-5, DSE-1

আত্মতত্ত্ব কেন দুর্জ্ঞেয় –কঠোনিষদের ব্যাখ্যা

যমরাজের নিকট নচিকেতা তৃতীয় বর হিসাবে আত্মতত্ত্ব বিষয়ে জানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু এই তত্ত্ব অত্যন্ত দুর্বোধ্য এবং তীব্র আধ্যাত্মিক অনুশীলনের দ্বারা মন প্রস্তুত না হলে এই তত্ত্বকে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না সেহেতু যমরাজ নানাভাবে নচিকেতাকে এ বিষয়ে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন নচিকেতার জিজ্ঞাস্য বিষয়টি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও দুরূহ। দেবতাগণও এ বিষয়ে সন্দিহান। প্রত্যক্ষাদি কোন প্রমাণ এ ক্ষেত্রে কাজ করে না। কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়টি জানা যায় না, আবার মন-বুদ্ধি দিয়ে বিচার করেও এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় না। সুতরাং – নচিকেতা যেন এই বর প্রার্থনা পরিত্যাগ করে অন্য বর চান। কিন্তু নচিকেতা নিজ সিদ্ধান্তে অবিচল থাকায় যমরাজ আত্মতত্ত্ব বিষয়ে তাকে উপদেশ দিতে শুরু করেন।

এ বিষয়ে উপদেশদানের শুরুতেই যমরাজ বলেন আত্মতত্ত্ব দুরূহ কারণ আমাদের মন যতক্ষণ বিষয়াসক্ত থাকে ততক্ষণ এর ধারণা করা যায় না। ইহসর্বস্ব বাল বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির উচ্চতর কোন লক্ষ্য থাকে না। এ জীবনের কর্মাদি নিয়ে তারা এতই ব্যাপৃত থাকে যে আত্মতত্ত্ব শোনবার অবকাশ ও তাদের থাকে না। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যদি এরূপ কথা তাদের কানে আসেও তাহলেও তারা সে কথার তাৎপর্য বুঝতে পারে না।

আবার আত্মতত্ত্বের উপদেষ্টাও ইদবাৎ পাওয়া যায়। কারণ আত্মাকে লোকে বহুরূপে চিন্তা করে। কেউ শরীরকে, কেউ মন বা বুদ্ধিকে, কেউ বা ইন্দ্রিয়কে আত্মা বলে মনে করে। কেউ ভাবে আত্মা এক কেউভাবে আত্মা বহু। কেউ ভাবে দেহের বিনাশে আত্মার বিনাশ কেইভাবে আত্মা দেহাতীত। কেউভাবে আত্মা কর্তা কেউভাবে আত্মা অকর্তা। আত্মা সম্পর্কে যত বিভিন্ন রকম স্ববিরোধী কল্পনা মানুষ করে ততই এই তত্ত্ব দুর্জ্ঞেয় হয়ে ওঠে। আত্মা অনুপরিমাণ থেকে অণুতর হওয়ায়, জগতের সব সূক্ষবস্তু থেকে সূক্ষ্মতম হওয়ায় তর্কের অতীত। তর্কের দ্বারা আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেলেও প্রবলতর কোন যুক্তি দ্বারা সেই সিদ্ধান্ত বাতিল হয়ে যেতে পারে। সুতরাং তর্কের দ্বারা আত্মাকে জানা যায় না। এ হল প্রত্যক্ষ উপলব্ধির ব্যাপার। যিনি সকলের মধ্যে নিজ আত্মাকে দেখেন এবং ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতা উপলব্ধি করেন একমাত্র তাঁরই এ বিষয়ে সকল দ্বন্দ্বের অবসান হয়। মিষ্টি না খেলে যেমন মিষ্টির স্বাদ বোঝা যায় না, তেমনি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ছাড়া আত্মাকে জানা যায় না।

আত্মাতত্ত্ব সাধারণের অগন্য কারণ যদিও তিনি প্রত্যকের হৃদয়রূপ গুহাতে রয়েছেন কিন্তু অজ্ঞানের আবরণের দ্বারা নিজেকে ঢাকা দিয়ে রেখেছেন। একটি গর্তের চারপাশে দেওয়াল থাকলে যেমন ভিতরের বস্তুকে দেখা যায় না তেমনি যে হৃদয় গহ্বরে তিনি রয়েছেন সেখানে অজ্ঞানের, বিষয়ের দেওয়াল রয়েছে। সেই জন্য তিনি অপ্রকাশিত থাকছেন। বাইরের বস্তুকে যেমনভাবে মানুষ দেখতে পায় তেমনভাবে আত্মাকে দেখা যায় না। কারণ যখন আমরা বাইরের বস্তু দেখি তখন দ্রষ্টা ও দৃষ্ট বস্তু এক নয়। কিন্তু আত্মা তো দ্রষ্টা থেকে পৃথক কোন বস্তু নন। তিনি সকলের অন্তরতম সত্তা। তথাপি যতক্ষণ না পর্যন্ত তিনি সার্বকের কাছে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করেন ততক্ষণ পর্যন্ত আত্মাকে কেউ দেখতে পায় না। মন যখন শান্ত হয়, চিত্ত যখন শুদ্ধ হয় তখন সেই স্বচ্ছ মনে আত্মা নিজেকে ধরা দেন। চিত্ত শুদ্ধির জন্য প্রয়োজন ইন্দ্রিয় সুখ থেকে, বিষয় বাসনা থেকে মনকে গুটিয়ে এনে আত্মাতে সমাহিত করা। আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে তাঁকে জানবার কোন উপায় নেই। তিনিই একমাত্র

জ্ঞাতা, বাকি সব বস্তু তাঁর জ্ঞেয়। এই নিত্য জ্ঞাতাকে মানুষ জ্ঞানের বিষয় করতে পারে না। তাই তিনি সাধারণের কাছে অজ্ঞেয়বৎ।

নিত্য প্রকাশমান হয়েও আত্মা স্বরূপও সাধারণ মানুষের কাছে অজ্ঞাত কারণ সর্বদায় আত্মার ওপরে আজস্র অনাত্ম বস্তুর প্রতিফলন হচ্ছে। ফলে আত্মা অনাত্মারূপে প্রকাশিত হচ্ছেন। জড় ধর্মের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে চেতন আত্মা জড়রূপে প্রকাশ পাচ্ছেন। দেহরূপ উপাধি তাঁর ওপর আরোপিত হওয়ায় দেহের পরিবর্তনের সঙ্গে তাঁকে পরিবর্তিত বলে মনে হচ্ছে। ইন্দ্রিয়রূপ উপাধি আরোপের ফলে তাঁকেইন্দ্রিয়ধর্মী বলে বোধ হচ্ছে, মনরূপ উপাধি আরোপের ফলে তাঁকে সুখ দুঃখ বিশিষ্টরূপে দেখাচ্ছে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ আত্মাকে সর্বদা উপাধি ধর্ম মিশ্রিতরূপে জানছে। ফলে তাঁর স্বরূপ সাধারণ মানুষের কাছে অধরা থেকে যাচ্ছে। আত্মাকে অসন্দিগ্ধভাবে জানতে হলে প্রয়োজন মনে শুদ্ধি। মন শুদ্ধ হলে অনাত্ম ধর্ম থেকে আত্মার পৃথকীকরণ সম্ভব হবে। এবং আত্মার সঙ্গে অভিন্নত্ব বোধ হবে। এই পৃথককরণ এবং অপরোক্ষ অনুভূতির মাঝে কোন মধ্যবর্তী সাধন নেই যার দ্বারা আত্মবস্তুকে লাভ করা যায়।

Semester-5, DSE-1

কঠোপনিষদ অনুসারে 'ওম্' পদের তাৎপর্য।

নচিকেতা যমরাজের নিকট ধর্মাধর্ম কার্যকারণাদি থেকে পৃথক নির্বিশেষ আত্মতত্ত্ব বিষয়ে জানতে চেয়েছিলেন। যেহেতু আত্মতত্ত্ব অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়, দুরধিগম্য বস্তু সেহেতু সেই তত্ত্বকে হঠাৎ স্বরূপ বর্ণনা না করে যমরাজ নচিকেতার মনকে সেই তত্ত্ব বিষয়ে ধারণা করার উপযোগী করে তোলার উদ্দেশ্যে প্রথমে ওঙ্কারের উপাসনার উপদেশ দিয়েছিলেন। শুদ্ধবুদ্ধিতে যে তত্ত্বকে সাক্ষাৎভাবেঅনুভব করা যায় তাকে অশুদ্ধ মন দিয়ে গ্রহণ করা সম্ভব নয় বলে মনের শুদ্ধির জন্য অথবা আত্মতত্ত্বকে সহজবোধ্য করবার জন্য যমরাজ প্রথমে ওঙ্কারের উপাসনার কথা বলেছিলেন।

যে তত্ত্বকে সমস্ত বেদ প্রাপ্তব্য বলে নির্দেশ করেও যে তত্ত্বকে জানবার জন্য সাধকের তপস্যা, বহু কৃচ্ছ্রসাধন, ব্রহ্মচর্যাদি অনুষ্ঠান, সেই তত্ত্বকেই যমরাজ সংক্ষেপে বলেছেন 'ওম্'। 'ওম্' কে শব্দব্রহ্ম বা প্রণব বলা হয়। 'ওম্' হল ব্রহ্মের প্রতীক। ব্রহ্মকে কোনভাবেই বর্ণনা করা যায় না। তিনি বাক্য মনের অতীত। কেবলমাত্র প্রতীকের মাধ্যমেই ব্রহ্মকে খানিকটা ধারণা করা যায়। ব্রহ্ম যদি শব্দ রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন তবে সেই শব্দ হল 'ওম্'। ব্রহ্মের স্বরূপকে বোঝাবার পক্ষে এটি উপযুক্ত প্রতীক। যদিও প্রতীক এবং সেটি যার প্রতীক দুটি বিষয় সম্পূর্ণ এক নয় তথাপি এ দুএর মধ্যে মিল থাকে। সমগ্র জগৎ যেমন ব্রহ্মের কাছ থেকে এসেছে তেমনি সমগ্র ধ্বনি জগতের উৎস 'ওম্'। 'আহত' এবং 'অনাহত' দুই-ই এর অন্তর্গত। 'ওম্' সগুন ব্রহ্ম এবং নির্গন ব্রহ্ম দুই অবস্থারই প্রতীক। যেহেতু 'ওম্' ব্রহ্মের প্রতীক সেহেতু 'ওম্' কে ধ্যান করলে ব্রহ্মেরই ধ্যান করা হয়। নির্গুন, নিরাকার, অব্যক্ত রূপে ব্রহ্মকে ধারণা করা কঠিন বলে তাঁর একটা রূপ কল্পনা করতে হয়। সেইরূপ হল 'ওম্'। সকল ধ্বনির অস্ফুট রূপ হচ্ছে ওঙ্কার। ব্রহ্ম যেমন জগতের আদি, তাঁর থেকেই জগৎ প্রপঞ্চ, তেমনি ওঙ্কার সমস্ত ধ্বনির আদি। 'ওম্' ব্রহ্মের অনভিব্যক্ত স্বরূপ যা থেকে জগতের সমস্ত স্থুল ও সুক্ষ্ম কারণের অভিব্যক্তি। এই জন্য ওঙ্কারকে ব্রহ্মের প্রতীক বলা হয়।

অ-উ-ম এই তিনটি বর্ণের সংযোগে 'ওম্' শব্দটি নিষ্পন্ন। তিনটি বর্ণের প্রতিটি বর্ণ জগতের এক একটি অবস্থাকে চিহ্নিত করে যথা স্থূল, সুক্ষ্ম এবং কারণ। বিভিন্ন অবস্থার সংক্ষিপ্ত রূপ ওঙ্কার সগুন এবং নির্গুন ব্রহ্মের প্রতীক। সগুন ব্রহ্ম হল সর্বভূতের অন্তরাত্মা। সগুন ব্রহ্মই সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ। এই সগুন ব্রহ্মের তিনটি নাম হল ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট। ঈশ্বর ব্রহ্মের নিমিত্তি বা কারণ অবস্থা, হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মের সূক্ষ্মাবস্থা ও বিরাট ব্রহ্মের স্থূলাবস্থাকে সূচিত করে। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। এই গুণগুলি ব্রহ্মের আরোপিত মাত্র, এরা ব্রহ্মের ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করে না। ব্রহ্ম অপরিবর্তনীয়। যেহেতু 'ওম্'সগুন ব্রহ্ম অর্থাৎ 'অপরাব্রহ্ম' এবং নির্গুন ব্রহ্ম অর্থাৎ 'পরা ব্রহ্ম' উভয়েরই প্রতীক সেহেতু ব্রহ্মকে লাভ করার পথে 'ওম্' এর উপাসনাই সর্বশ্রেষ্ঠ। সাধক যখন 'ওম্' কে কেবলমাত্র ব্রহ্মের প্রতীক বলে উপাসনা করেন তখন অপরা ব্রহ্ম অর্থাৎ সগুন ব্রহ্মের সাধনার মাধ্যমে তিনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। সেই লোকে সাধক ব্রহ্মের সমমর্যাদা লাভ করেন। কালে 'ওম্' এর ধ্যান করেই সাধক ব্রহ্মে লীন হয়ে যান। সাধকের কাছে তখন 'ওম্' আর কেবলমাত্র প্রতীক নয় স্বয়ং ব্রহ্ম।

এইভাবে যমরাজ ওঙ্কাররূপ প্রতীক উপাসনার মাধ্যমে নচিকেতার নিকট আত্মতত্ত্ব তথা পরব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধির পথ নির্দেশ করেছিলেন।

Semester-6, DSE-3

সাধনা গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ "বিভেদ ও শাসনের" নীতি বলতে কি বুঝিয়েছেন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সাধনা গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ 'The Relation of the Individual to the Universe' এ পাশ্চত্য নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় অরণ্যকেন্দ্রিক সভ্যতার তুলনা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত উক্তিটি ব্যবহার করেছেন।

গ্রীসের সভ্যতাকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ইটঁ, পাথর, চুনবালি দিয়ে গড়া প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে গ্রীক সভ্যতা গড়ে ওঠার ফলে গ্রীসবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সিমাবদ্ধ। এই প্রাচীর বেষ্টনী সেখানকার মানুষের মনে "বিভেদ ও শাসনের" এক মনোভাব জাগিয়ে তুলেছিল, মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছিল। নগরকেন্দ্রিক সভ্যতায় বেড়ে ওঠা মানুষ তাদের অর্জিত সম্পদ প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে কুক্ষিগত করে রাখতে ব্যস্ত ছিল। প্রাচীর বেষ্টনীর বাইরের জগৎ সম্পর্কে তাদের মনে ছিল গভীর সন্দেহ। কৃত্রিমভাবে গড়ে ওঠা এই প্রাচীর একের থেকে অন্যকে বিচ্ছিন্ন করার একটি অভ্যাস মানুষের মনে জাগিয়ে তুলেছিল। বহির্বিশ্বের প্রতি এইর বৈরিতার মনোভাব দেশ থেকে দেশকে, মানুষ থেকে প্রকৃতিকে বিচ্ছিন্ন করেছিল। নিজেদের জীবন ও কর্মের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে নগরকেন্দ্রিক সভ্যতায় বেড়ে ওঠা শহরে মানুষ এক কৃত্রিম বিভাজন সৃষ্টি করে বিশ্ব প্রকৃতি থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ বিযুক্ত করে নিয়েছিল।

কিন্তু ভারতীয় মানসিকতা ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের আর্য অনুপ্রবেশকারীদের কথা স্মরণ করে বলেছেন, অরণ্যচারী আর্যরা প্রকৃতি প্রাণবন্ত অগ্রগতির সঙ্গে সব সময় সংযুক্ত থাকায় নিজের অধিকৃত সম্পদের চারিদিকে সীমানা প্রাচীর তুলে নিজের রাজত্ব বিস্তারের আকাঙ্খা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। তাদের লক্ষ্য অধিকার করা নয়, উপলব্ধি করা। নিজের চেতনাকে উন্নত করে সমস্ত কিছুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সর্বব্যাপী সত্যকে উপলব্ধি করাই ছিল ভারতবাসীর জীবনের লক্ষ্য। মানবাত্মা ও বিশ্বাত্মার মধ্যে এক মহান সমন্বয় উপলব্ধি করাই ছিল প্রাচীন ভারতে অরণ্যবাসী ঋষিদের একমাত্র প্রচেষ্টা।

রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে ভারতবর্ষের অরণ্যচারী আর্য অনুপ্রবেশকারীদের দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত পাশ্চত্য নগরকেন্দ্রিক সভ্যতায় বেড়ে ওঠা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য

উত্তরঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'সাধনা' গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ "The relation of the Individual to the Universe" এভারতবর্ষের অরণ্যচারী আর্য অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে পাশ্চাত্য নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার বেড়ে ওঠা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছেন।

কৃত্রিম প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে গড়ে ওঠা পাশ্চাত্য সভ্যতা সেখানকার মানুষের মনে এক 'বিভেদ ও শাসনে'র মানসিকতা জাগিয়ে তুলেছিল, তাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে সীমাবদ্ধ করেছিল। যে বিশ্বপ্রকৃতির বুকে তার অবস্থান সেই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তার নিজের এক কৃত্রিম বিচ্ছেদ সৃষ্টি করেছিল। পাশ্চাত্যের মানুষ মনে করত

এক প্রতিকূল জগতে তার বাস, যেখানে সে যা কিছু চায় সব কিছুকে এক অপরিচিত ব্যবস্থাথেকে তাকে জোড় করে আদায় করতে হয়। তার ফলে প্রকৃতি সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ বৈরিতার মনোভাব পোষণ করত এবং প্রকৃতিকে পরাভূত করতে পেরেছে ভেবে গর্ব অনুভব করত। পশ্চিমের একটি প্রচলিত অনুভূতি হলে। প্রকৃতি শুধুমাত্র অচেতন বস্তু সুতরাং অস্তিত্বের তুলাদন্ডে তার স্থান সব থেকে নীচুতে। প্রকৃতি জীবজন্তুদের অধিকারভুক্ত। হঠাৎ অকারণে নিয়মভঙ্গ হওয়ায় সেখানে মানবপ্রকৃতির সূত্রপাত। সেখানকার মানুষের চোখে যা কিছু বৌদ্ধিক বা নীতিবিষয়ক তাই একমাত্র উৎকৃষ্ট। সুতরাং অস্তিত্বের তুলাদন্ডে মানুষের স্থান সর্বোচ্চে। পাশ্চত্যের মানুষ যদিও প্রকৃতির কাছে তাদের শক্তি ও সম্পদের জন্য ঋণী ছিল কিন্তু তারা কোনভাবেই প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মবোধ করেনি। প্রকৃতি কখনই তাদের কাছে মানবাত্মা ও বিশ্বাত্মার মিলনস্থল হয়ে ওঠেনি। পশ্চিমের আধুনিক সভ্যতা তার সীমাহীন প্রাণ শক্তিকে নিয়েজিত করেছে মানুষকে দেহগত, বুদ্ধিগত, নীতিগত যোগ্যতায় সম্পূর্ণ করে তোলার কাজে, পারিপার্শ্বিককে নিজের অধিকারে নিয়ে আসার কাজে। সব কিছুর ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করাই ছিল পাশ্চাত্য আধুনিক সভ্যতার একমাত্র লক্ষ্য।

কিন্তু ভারতবর্ষের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ভারতীয় সভ্যতার জন্ম হয়েছিল অরণ্যে। প্রকৃতির প্রাণবন্ত অগ্রগতির সঙ্গে সর্বদা সংযুক্ত থাকার কারণে সে অনুভব করেছিল সত্য সর্বব্যাপী এবং সেই সত্যকে লাভ করার একমাত্র উপায় সমস্ত কিছুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নিজের সত্তাকে পরিব্যাপ্ত করা। মানবাত্মা ও বিশ্বাত্মার মধ্যেকার মহান সমন্বয় উপলব্ধি করাই ভারতবাসীর জীবনের উদ্দেশ্য ছিল বলে নিজের অধিকৃত সম্পদের চারিদিকে প্রাচীর তুলে নিজের রাজত্ব বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা থকে সে নিজেকে মুক্ত রেখেছিল। জগৎ কে সে এক মহান সত্যের অংশরূপে গণ্য করেছিল। ভারতবাসী অনুভব করেছিল পারিপার্শ্বিক সব কিছু যদি মানুষের কাছে একান্তভাবে বহিরাগত হত তাহলে মানুষ কোনভাবেই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারত না। যাদের সঙ্গে সত্যই সম্বন্ধ আছে তাদের ছাড়া অন্য কিছুকে আপন করা যায় না। ভারতবর্ষের কাছে পরম সত্য হল প্রকৃতির সঙ্গে সে নিজে সমন্বিত। প্রকৃতির সঙ্গে তার আত্মীয়তা, সকলের সঙ্গে তার অটুট বন্ধন স্বীকারে ভারতবাসী কখন দ্বিধা করে নি। তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল অনুভবে, কর্মে সৃষ্টির মূলগত ঐক্যকে উপলব্ধি করা। সে চেয়েছিল আত্মার দ্বারা আত্মাকে প্রত্যক্ষ করতে। ভারতবর্ষ জেনেছিল মানুষ যখন শারীরিক ও মানসিক বাধার দ্বারা প্রকৃতির অফুরন্ত জীবন থেকে জোর করে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে তখন সে মানুষ মাত্র হয়ে ওঠে, বিশ্বের মানুষ হয়ে উঠতে পারে না।এর অর্থ এই নয় যে ভারতবর্ষ বিভিন্ন বস্তুর মূল্যের পার্থক্য অগ্রাহ্য করেছিল। সৃষ্টির ক্রম পর্যায়ে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা যে তার মনে ছিল না তা নয়। কিন্তু সে মনে করত মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব তার অধিকারের শক্তিতে নয়, বরং তার ঐক্যের শক্তিতে।

পরিশেষে বলা যেতে পারে, যদিও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর আলোচ্য প্রবন্ধে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের দৃষ্টিভঙ্গীর একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছিলেন কিন্তু তিনি কখনই দুটি সভ্যতার কোন একটিকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দেননি। বরং তিনি মনে করেছিলেন বিভিন্ন জায়গার মানুষ মানবতার বাণিজ্য কেন্দ্রে তাদের উৎপাদিত বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে আসবে এবং এই সামগ্রীগুলির প্রত্যেকটি হবে একে অপরের পরিপূরক ও অত্যাবশ্যক।

Semester-5, DSE-1

কঠোপনিষদ অনুসারে আত্মার স্বরূপের বর্ণনা

যমালয়ে যমরাজের সঙ্গে মিলিত হবার পর নচিকেতা তাঁর কাছে ধর্মাধর্ম, কার্যকারণাদি থেকে পৃথক নির্বশেষ আত্মাতত্ত্ব বিষয়ে জানতে চান। তখন শুরু হয় দুজনের মধ্যে দীর্ঘ কথোপকথন। যার ফলস্বরূপ আমরা পাই আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে নানা দার্শনিক তত্ত্ব।

যমরাজ নচিকেতাকে জানান আত্মাকে ভাষায় প্রাকাশ করা যায় না। তিনি আমাদের ভেতরে আছেন আবার বাইরেও আছেন। তিনি জগতের আশ্রয়। এই জগতের মধ্যে দিয়ে আত্মা নিজে প্রকাশ করেন কিন্তু এতেই ফুরিয়ে যান না। তিনি জগতের অতীত এবং স্বাধীন। কোন বিধি নিষেধের দ্বারা তিনি বদ্ধ নন। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ তিন কালের তিনি ঊর্ধ্বে।

আত্মার জন্ম নেই, মৃত্যু ও নেই। কোন বস্তুর প্রথম উৎপত্তিকে জন্ম বলা হয়। আত্মার এজাতীয় কোন জন্ম নেই। আত্মার মৃত্যু নেই। কারণ যাঁর জন্ম হয় নি তাঁর মৃত্যু হতে পারে না। আত্মা কোন কিছুর কার্য নয়। প্রত্যেক কার্যেরই কোন না কোন কারণ থাকে। কারণ না থাকলে কার্য থাকতে পারে না। আত্মা অনাদি অর্থাৎ সব কিছুর আদি কারণ হল এই আত্মা। আত্মা অপরিবর্তিত এবং অপরিবর্তনীয়। আত্মার কোন ক্ষয় বা বৃদ্ধি নেই আত্মা শাশ্বত, এক ও অভিন্ন। আত্মা একযোগে প্রাচীন এবং নবীন দুই-ই যেহেতু তাঁর কোন অপচয় বা উপচয় অর্থাৎ হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। শরীরের বিনাশ হলেও তিনি বিনষ্ট হন না। আত্মার বিনাশ বা বিনাশ-কর্তৃত্ব কল্পনা করা দুই-ই ভ্রমাত্মক। আত্মা অধিকারী, স্বতন্ত্র ওনির্গুন। আত্মা অকর্তা। তিনি দৃশ্যমান জগতে যা কিছু ঘটে তার নির্লিপ্ত দ্রষ্টা বা সাক্ষী মাত্র। তিনি আছেন বলেই আমরা বেঁচে আছি। কিন্তু শরীরের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন না।

আত্মা অণু থেকেও অণুতর, মহৎ থেকেও মহত্তর অর্থাৎ তিনি অণু ও নন মহৎ- ও নন। অণু- মহৎ, সূক্ষ্ম-স্থূল- এগুলি তাঁর উপাধি। কিন্তু তিনি এই উপাধি সকলের দ্বারা অস্পৃষ্ট। তাঁর প্রকৃত স্বরূপ জানলে দেখা যাবে সকল পরিবর্তনের পেছনে এক অপরিবর্তনশীল সত্তারূপে তিনি রয়েছেন যাঁর ওপর পরিবর্তনগুলি আরোপিত হচ্ছে মাত্র। অনাত্ম আরোপিত ধর্মগুলি তাঁর ওপর অধ্যস্ত হতে থাকলে ও তাঁতে কোন পরিবর্তন বা বিকার আনতে পারে না। তিনি চিরন্তন অধিকারী রূপেই থাকেন।

আত্মার মহিমা কীর্তন করে আত্মতত্ত্ব যে অতি সূক্ষ্ম তা বোঝাবার জন্য যমরাজ নচিকেতাকে বলেছেন আত্মা সকল বিপরীত ভাবের মিলন সেতু, সব বৈচিত্র্যের মূল ঐক্য। তিনি অচল হয়েও সচল, নিষ্ক্রিয় হয়েও সক্রিয়, একই সঙ্গেঁ আনন্দ ও নিরানন্দরূপ।

আত্মার কোন রূপ নেই। আবার এ জগতের সব রূপই তাঁর রূপ। তাই তো তিনি নিরাকার হয়েও সাকার। সর্ববস্তুতে আত্মা থাকলেও এতেই তিনি শেষ হয়ে যান নি। সব কিছুকে অতিক্রম করেও তিনি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

আত্মা শব্দহীন, স্পর্শহীন, গন্ধহীন। তিনি শাশ্বত ও অবিনাশী, অনাদি ও অনন্ত। বাক্য মনের অতীত। হিরণ্যগর্ভের চেয়েও তিনি শ্রেষ্ঠ। তাঁকে জেনে মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করে।

'সাধনা' অনুসারে প্রেম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত

"সাধনা" প্রবন্ধমালার বিভিন্ন প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রেম সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি প্রকাশ করেছেন। উপনিষদ উদ্ধৃত করে তিনি বলেছেন আনন্দের থেকে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, আনন্দের মধ্যেই জীবিত থাকে, আনন্দের দিকে তারা অগ্রসর হয় এবং আনন্দের মধ্যে প্রবেশ করে। এর অর্থ হল সৃষ্টির মূলে নেই কোন প্রয়োজন, রয়েছে সৃষ্টি কর্তার আনন্দ। এই আনন্দের অপর নাম প্রেম, যার প্রকৃতিতে রয়েছে দ্বিত্ব। একটি বিচ্ছেদ এবং অপরটি মিলন। প্রথটি প্রেমের বাহ্য প্রকাশ মাত্র, দ্বিতীয়টি পরম সত্য। পরমাত্মা নিজেকে দুভাগে বিভক্ত করেছেন। মানবাত্মা তাঁর প্রেমাস্পদ, এ তাঁর দ্বিতীয় সত্তা। পরমাত্মা নিজের কাছ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করেন আরো আপন করে পাবার জন্য। বাধার মধ্যে দিয়ে মিলনকে নিবিড় ভাবে উপলব্ধি করার জন্য পরমানন্দ স্বরূপ ঈশ্বর সৃষ্ট জগতের সঙ্গেঁ, মানবাত্মার সঙ্গেঁ কৃত্রিম বিচ্ছেদ সৃষ্টি করেন। এই বিচ্ছেদ যদি পারমার্থিক হতো তাহলে আমরা অসত্য থেকে কখনই সত্যে পৌঁছাতে পারতাম না, পাপের থেকে কখনই হৃদয়ের শুদ্ধতা লাভ করার আশা করতে পারতাম না। তাহলে সমস্ত বিপরীত চিরদিন বিপরীত হয়েই থাকতো, আমরা কোনদিন এমন কোন মাধ্যম পেতাম না যেখানে আমাদের সমস্ত পার্থক্য মিলনাভিমুখী হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন মানবাত্মা পরমাত্মা থকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ঠিকিই, কিন্তু তা পর হয়ে যাওয়া থেকে হয় নি বরং হয়েছে প্রেমের পরিপূর্ণতা থেকে। সেই কারণেই যখন আমরা রূপ থেকে সেই কারণেই যখন আমরা রূপ থেকে আনন্দে, নিয়ম থেকে প্রেমে ফিরে যাই, যখন সমীমের বন্ধন ছিন্ন করি তখনই আমরা আমাদের অভীষ্ট সাধন করি। নিজের বাইরে নিজেকে আবিষ্কার আমাদের আনন্দিত করে। প্রেমই হল পরম আনন্দ যা মানুষ লাভ করতে পারে, কারণ একমাত্র প্রেমের মধ্যে দিয়েই মানুষ জানতে পারে যে সে নিজের থেকে অনেক বড় ও সর্বময়ের সঙ্গেঁ এক। প্রেমের ভেদের অনুভূতি মুছে যায় ও মানবাত্মা নিজের সীমা অতিক্রম করে ও অসীমের প্রবেশ দ্বার পেরিয়ে পূর্ণতার মধ্যে জীবনের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে। প্রেমের বশবর্তী হয়ে যাঁরা ব্যক্তিসত্তাকে বির্সজন দেন, যাঁরা আত্মার জন্য জীবনযাপন করেন তাঁদেরকেই আমরা বলে থাকি মহাত্মা। প্রেম হচ্ছে চেতনার পূর্ণতা। এ কোন তুচ্ছ হৃদয়াবেগ নয়। চেতনার প্রসারণ প্রেমে পরিণত হয়ে সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্তি লাভ করে। বুদ্ধদেব একেই বলেছেন ব্রক্ষবিহার, ব্রক্ষের আনন্দে জীবিত থাকা। প্রেম স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেকে অবিরাম উপহার দেয়। কিন্তু এই উপহারগুলি তাদের তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে যদি না আমরা তাদের অবলম্বন করে সেই অনন্ত প্রেমে পৌঁছাতে পারি যিনি এই প্রেম বিতরণ করেন।

প্রেমের মধ্যে অস্তিত্বের সমস্ত বৈপরীত্য মিশে গিয়ে হারিয়ে যায়। একমাত্র প্রেমেই দ্বৈত ও অদ্বৈত বিরুদ্ধ হয়না। প্রেম একই সঙ্গেঁ এক ও দুই হতে পারে। প্রেমই একাধারে গতি ও স্থিতি। প্রেমের মধ্যে ক্ষতি ও লাভ সমন্বিত। প্রেমই বিসর্জন ও গ্রহণ করাকে একত্রিত করে, অবিচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত রাখে। এই প্রেমই একদিকে রয়েছে ইতিবাচক ঘোষণা- "আমি আছি", অন্য দিকে দৃঢ় অস্বীকৃতি "আমি নেই"। প্রেমে বন্ধন ও মুক্তির মধ্যে কোন বৈরিতা নেই। প্রেমে দাসত্ব বন্ধন ও স্বাধীনতা সমানভাবে মহিমান্বিত। প্রেমের কাজ হল সসীম সব কিছুকে

স্বাগত জানানো ও তাদের উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়া। প্রেমের মাধ্যমেই ঐক্যের সত্য উপলব্ধি করা সম্ভব। জগতের সঙ্গেঁ মানাবত্মার ঐক্য এবং পরম প্রেমিকের সঙ্গেঁ বিশ্বত্মার ঐক্য উপলব্ধি করতে পারলেই আনন্দ।

Semester-6, DSE-3

‘সাধনা’ অনুসারে রবীন্দ্র ভাবনায় বৌদ্ধদর্শনের প্রভাব

‘সাধনা’ প্রবন্ধমালার বিভিন্ন প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় বুদ্ধদেব এবং বৌদ্ধদর্শনের যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বুদ্ধদেবের বাণী ও নীতির প্রতি রবীন্দ্রনাথ যে আকৃষ্ট ছিলেন তা তিনি তাঁর বিভিন্ন রচনায় প্রায়ই উল্লেখ করেছেন।

বুদ্ধদেব উপনিষদের ব্যবহারিক দিকটিকে কেন্দ্র করে যে ব্রহ্মবিহারের কথা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন অপরিমিত মানসকে প্রীতিভাবে মৈত্রীভাবে বিশ্বলোকে ভাবিত করে তোলাই হল ব্রহ্মবিহার। সে প্রীতি সামান্য প্রীতি নয়। বুদ্ধদেবের উপদেশ ছিল মা যেমন আপণ আয়ু ক্ষয় করে নিজের একমাত্র পুত্রকে রক্ষা করে তেমনি সকল প্রাণীর প্রতি মনে অপরিমেয় দয়ার ভাব জাগাতে হবে। বুদ্ধদেব মানুষের অপরিমিত প্রেমের কথা বলেছিলেন যা তার অন্তরের অপরিমেয় সত্যকে প্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য মানুষের অন্তরের যে সোহহং বোধ তাকে সার্থক করার জন্যই মানুষ হয়ে জন্মানো। সোহহং বলতে বোঝায় সকল মানুষের প্রতি প্রেম যার পরিণামে মানুষ তার অহংবোধকে ছাড়িয়ে পরম মানবের সঙ্গেঁ মিলিত হয়। ‘সাধনা’ গ্রন্থের একাধিক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রেমের ভেতর দিয়ে অসীমকে উপলব্ধির যে কথা বলেছেন তার মূলে ছিল বুদ্ধদেবের মৈত্রীভাবনা। প্রেমের ভেতর দিয়েই অসীমকে লাভ করা সম্ভব। আত্মা পরিপূর্ণতা লাভ করে যখন তার মধ্যে প্রেমের ভাব জাগে। বুদ্ধদেব বলেছেন আত্মার এই অবস্থায় পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজন শীল গ্রহণ ও শীল সাধনা। শীল সাধনার দ্বারা মৈত্রীকে অবাধে বিস্তার করা যায়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এ হ’ল মানসের সঙ্গে মানস, প্রেমের সঙ্গেঁ প্রেমের মিলন। এর জন্য প্রয়োজন মানুষের সংযমী চরিত্র। বুদ্ধদেবের মত রবীন্দ্রনাথও সংযমী চরিত্র গঠনের জন্য বাসনা বর্জনের শিক্ষা দিয়েছেন।

রবীন্দ্র দর্শনের মানব কেন্দ্রিকতা ও বৌদ্ধধর্ম থেকে গৃহীত। বুদ্ধদেবই প্রথম কোন মানুষকে মানুষের মধ্যে অনেক বড় করে দেখেছিলেন। বলেছিলেন মানুষের কর্মই মানুষেকে দেবতার পদে উন্নীত করে। রবীন্দ্রনাথও মানব দেবতাকে মানুষের মধ্যে অন্বেষণ করেছিলেন।

বুদ্ধদেবের মৌলিক সিদ্ধান্ত ছিল জগৎ দুঃখময় এবং দুঃখের বিনাশ কাম্য। রবীন্দ্র দর্শনেও দুঃখ একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দুঃখের বিনাশ চান নি, কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন দুঃখের মধ্যে দিয়ে গিয়েই মানুষের আত্মশুদ্ধি ঘটে। দুঃখই পারে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের বোধ জাগ্রত করতে।

রবীন্দ্রনাথ দর্শন উপনিষদ ভিত্তিক হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু ধম্মপদে যে সকল ধর্মপ্রবচন ও হিতোপদেশ আছে তাতে আমাদের মহাভারত, গীতা ও অন্যান্য নীতিশাস্ত্রের সাদৃশ্য উপলক্ষিত হয়। তাই হয়তো রবীন্দ্রদর্শনে বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

'সাধনা' অনুসারে ইপ্সা ও এষণার মধ্যে পার্থক্য

'সাধনা' গ্রন্থের 'Problems of Evil' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানুষের নৈতিক প্রকৃতি বর্ণনা প্রসঙ্গে ইপ্সা ও এষণার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। যে সকল বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করে তা পাওয়ার বাসনা হল ইপ্সা এবং যা মানুষের অন্তরের অভীষ্ট লক্ষ্য, যা পাওয়ার জন্য মানুষ তার অন্তরে সংকল্প নিয়েছে তা হ'ল এষণা।

রবীন্দ্রনাথের মতে নিজের যথার্থ স্বরূপের প্রতি যখন মানুষের দৃষ্টি প্রসারিত হতে শুরু করে, যখন মানুষ উপলব্ধি করে যে বর্তমানে তার নিজেকে যা মনে হচ্ছে সে তার থেকে অনেক বড় তখন জীবন সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়। তখন সে ইপ্সা ও এষণার মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করে এবং এষণা তখন ইপ্সার জায়গা নেয়। ইপ্সার যোগ আমাদের ছোট আমির সঙ্গেঁ কিন্তু এষণার যোগ বড়আমির সঙ্গেঁ। এষণা হল বৃহত্তর জীবনের আকাঙ্ক্ষা, আমাদের ইন্দ্রিয়কে প্রভাবিত করে এমন কিছু পাওয়ার বাসনা নয়। এষণা হল জীবনের অন্তিম ইচ্ছা। মানুষ দূরদর্শী। সে তার অনুপলব্ধ ভবিষ্যতের জন্য বর্তমান কালের আকর্ষণীয় বস্তুকে ত্যাগ করতে নিজেকে প্রস্তুত করে। কারণ সে জানে আজ যা তাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করছে, যা তার ইপ্সা, কাল তার প্রতি সে কোনো আকর্ষণ বোধ না ও করতে পারে। তখন সে তার ক্ষণিকের চাওয়া পাওয়াকে অকিঞ্চিৎকর মনে করে। তার জীবনের প্রেক্ষিত তখন বদলে যায়। নিজের বৃহত্তর সত্তা বড় আমির জন্য যা তার অভীষ্ট সেই এষণাকে সে ইপ্সার স্থান দেয়।

Semester-6, DSE-3

'সাধনা' অনুসারে Soul ও Self এর পার্থক্য

'সাধনা' গ্রন্থের Soul Consciousness প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন আমাদের আত্মা যখন নিজের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে বিচ্ছিন্ন ও আবদ্ধ হয়ে থাকে তখন তা হল Self, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'ছোট আমি'। আমাদের স্বার্থকেন্দ্রিক আবেগ, স্বার্থপর আকাঙ্খা আত্মা সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিকে ঝাপসা করে দেয়। এগুলি আমাদের ক্ষুদ্র, সত্তাকে দেখায়। এই আত্মকেন্দ্রিক সত্তা ব্যক্তিগত পরিমন্ডলের বাইরে নিজেকে অনুভব করতে পারে না। অহংকারের সুদৃঢ় স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করে এই ক্ষুদ্রসত্তা সমস্ত দম্ভ, আকাঙ্খা ও নির্মমতার উৎস হয়ে শুধুমাত্র নিজের স্বার্থসাধনে সচেষ্ট থাকে। অবিদ্যা মানুষের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে তাকে এই ব্যক্তিসত্তার (Self) বেষ্টনীর মধ্যে সীমিত করার চেষ্টা করে। এই অবস্থাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন আধ্যাত্মিক নিদ্রা। মানুষের এই অহংবশ্যতা স্বীকার করেনা অসীম সম্বন্ধে এ অন্ধ। আত্মার প্রকাশে তা বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু মানুষ যখন ব্যক্তিসত্তার সুপ্ত অবস্থা থেকে পূর্ণ চেতনায় জাগ্রত হয় তখন সে আত্মা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। তখন সে তার আন্তর সত্তা, তার Soul কে প্রত্যক্ষ করে। এই Soul অহংকে অতিক্রম করে ও সর্বময়ের সঙ্গেঁ গভীরতর সম্বন্ধে যুক্ত হয়। আত্মার মূল বৈশিষ্ট হল ঐক্য। আত্মা যখন নিজের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে তখন সে তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। একমাত্র অন্যের সঙ্গেঁ নিজেকে ঐক্যবদ্ধ ক'রে সে তার সত্য পরিচয় খুঁজে পায়। মানুষ যখন ব্যক্তিসত্তার ওপর প্রভুত্ব অর্জন ক'রে সকল গর্ব, লোভ, ভয়ের উর্ধ্বে উঠে

চেতনার পরিধিকে প্রসারিত করতে সক্ষম হয়, তখন সে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করে। এই উপলব্ধিতাকে দেয় অসীম আনন্দ কারণ মানুষ আত্মার (Soul)জন্য জীবন যাপন করে ব্যক্তিসত্তা (Self) এর জন্য নয়।

Semester-5, DSE1

কঠোপনিষদ অনুসরণে জীবের রথ-উপমার ব্যাখ্যা

কঠোপনিষদ্ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় তৃতীয় বল্লীতে জীবাত্মা, মন, বুদ্ধি এবং দেহের সম্পর্ক বোঝাতে রথের একটি চমৎকার উপমা ব্যবহার করা হয়েছে। সেখানে জীবের শরীরাধিষ্ঠিত আত্মাকে রথের রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি এবং মনকে বল্গা রূপে কল্পনা করা হয়েছে। রথী হল রথে চড়ে যে গন্তব্য স্থানে যায়। রথী ও রথে যে পার্থক্য আত্মা আর শরীরে সেই পার্থক্য। রথ যেমন কোনভাবেই রথী হতে পারে না তেমিনি দেহ আত্মা হতে পারে না। রথীর প্রয়োজন সিদ্ধ করার জন্য সারথি যেমন রথকে চালনা করে তেমনি দেহকে চালনা করে বুদ্ধি। তাই বুদ্ধিকে সারথি বলা হয়েছে। মন হল লাগাম এবং ইন্দ্রিয়গুলি হ'ল রথের ঘোড়া। লাগাম দিয়ে ঘোড়াগুলিকে সংযত করে যেমন নির্দ্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে সারথি চালনা করে তেমনি ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে মনরূপ লাগাম। ইন্দিয়গ্রাহ্য বিষয় অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি হ'ল ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বের বিচরণভূমি। ঘোড়ার মত ইন্দ্রিয়গুলি সদা চঞ্চল এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ করা ঘোড়ার মতই কঠিন। ভালোমন্দ নির্বিচারে সব বস্তুই ইন্দ্রিয়কে আকৃষ্ট করে। ইন্দ্রিয় ভালো মন্দ বিচারের অক্ষম। মনই হল ইন্দ্রিয়ের নিয়ামক।

রথের ঘোড়াগুলি যদি দুষ্ট হয়। সারথির আজ্ঞানুবর্তী না হয় তাহলে রথী যেমন গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে না তেমনি বুদ্ধিরূপ সারথি যদি প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, উচিত-অনুচিতের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে ব্যর্থ হয় এবং একই সঙ্গেঁ সে যদি অসংযত মনের সঙ্গেঁ যুক্ত হয়, তাহলে বুদ্ধির অবস্থা হবে সেই সারথির মত যার ঘোড়াগুলি অ-বশ্য অর্থাৎ বশীভূত নয়।

কিন্তু যে সারথি পূর্বোক্ত সারথির মত নন অর্থাৎ যিনি বিজ্ঞানবান অর্থাৎ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, উচিৎ-অনুচিত, সৎ -অসতের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম এবং মন যার বশীভূত তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি সুশিক্ষিত ঘোড়ার মত তাঁর বশে থাকে। কারণ ইন্দ্রিয়দের পরিচালিত করে মন, মনকে চালায় বুদ্ধি। বুদ্ধি মনের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। মনরূপ লাগাম যদি বুদ্ধির হাতে শক্ত করে ধরা থাকে তাহলে ইন্দ্রিয়রূপ ঘোড়াগুলি বশীভূত থাকে। এরকম বিজ্ঞানবান শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করেন অর্থাৎ তিনি পরামাত্মার সঙ্গেঁ মিলিত হন। তাঁকে আর জন্মাতে হয় না।

কঠোপনিষদে রথরূপ রূপকের সাহায্যে দেখানো হয়েছে যে, মানুষ নিজেই নিজেই নিজের ভাগ্যবিধাতা। তাকে নিজেই নিজের প্রভু হতেহবে। বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়-এগুলি যন্ত্র মাত্র। এই যন্ত্রগুলির ওপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। বুদ্ধিকে ব্যবহার করতে হবে সঠিক পথ দেখাবার জন্য। বুদ্ধি মাঝে মাঝে ভুল করে বলে তাকে সতর্ক করতে হবে যাতে ভুলের পুনরাবৃত্তি না হয়। মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বুদ্ধিকে নির্দ্দেশ দিতে হবে। বুদ্ধি সজাগ থাকলে মনকে বশে আনা সহজ হবে। মন যেহেতু প্রধান ইন্দ্রিয় সেহেতু মন নিয়ন্ত্রিত থাকলে বহিরিন্দ্রিয়

কোন সমস্যা করতে পারে না। মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় সংঘবদ্ধভাবে কাজ করলে তবেই জীবাত্মার সঙ্গেঁ পরমাত্মার মিলন সম্ভব হবে। এই পরমাত্মার সঙ্গেঁ মিলিত হওয়াই মানব জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য।

Semester-5, DSE-1

কঠোপনিষদ অনুসরণে ‘উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত’ – শ্লোকের ব্যাখ্যা

কঠোপনিষদের তৃতীয় বল্লীর এটি চোদ্দ নং শ্লোক এবং এটি উপনিষদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মন্ত্র। অবিদ্যায় নিমজ্জিত ইন্দ্রিয়াসক্ত মানুষের প্রতি উপনিষদের এ এক উদাত্ত আহ্বান। ইন্দ্রিয়াসক্ত মানুষ ইন্দ্রিয় সুখের চেয়ে বৃহত্তর সুখ আর কিছু জানে না। উপনিষপদ কৃপাপরবশ হয়ে তাদের জাগাচ্ছেন, মোহনিদ্রা ত্যাগ করতে বলছেন। আত্মার গন্তব্য স্থল সম্বন্ধে সচেতন হতে বলছেন। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু অধিকাংশ মানুষের কাছে শেষ কথা হলেও ইন্দ্রিয় গোচর নয় এমন বস্তু আছে যা স্থায়ী আনন্দের সন্ধান দিতে পারে। সর্বোচ্চ, মহত্তম অবিনাশী সেই বস্তুকে লাভ করতে গেলে ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগ্য আচার্যের শরণাপন্ন হতে হবে ‘প্রাপ্যবরান নিবোধত’-উক্তির মধ্যে দিয়ে একথাই বলতে চাওয়া হয়েছে।আচার্য যে পথ নির্দেশ করবেন সেই পথই হল আত্মজ্ঞানের পথ। এই পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়, অত্যন্ত দুর্গম। পথের দুর্গমতাকে বোঝাতে গিয়ে উপনিষদ বলেছে শাণিত ক্ষুরের অগ্রভাগ দিয়ে হেঁটে চলতে গেলে পা যেমন ক্ষতবিক্ষত হয় তেমনি অশেষ আয়াস করেই আত্মজ্ঞান লাভের পথে অগ্রসর হতে হয়। ‘কবয়ঃ’ অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মবিৎ, যাঁরা এই পথে গিয়েছেন তাঁরাই একথা বলেছেন। তাঁরা বারংবার পরম প্রাপ্তির পথকে কঠিনতম বলে চিহ্নিত করেছেন। তবে কঠিন হলেও এই জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব নয়। এরজন্য প্রয়োজন হল প্রকৃত উৎসাহ, কঠোর পরিশ্রম অধ্যাবসায় এবং সদ্‌গুরুর আশ্রয়। বীর্য সহকারে জেগে উঠে উপযুক্ত গুরুর নিকট পথ নির্দেশ নিয়ে ঐকান্তিক দৃঢ়তা সহকারে এই পথে অগ্রসর হলে তবেই পরমপ্রাপ্তি সম্ভব।

Semestr-6, DSE-3

‘সাধনা’ শিরোনামের তাৎপর্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘সাধনা’ গ্রন্থের সাধনা নামকরণটি বিশেষ তাৎপর্যবহ। ব্যাপক অর্থে কোন বিষয়ে সিদ্ধি লাভের জন্য ঐকান্তিক প্রচেষ্টাকে বলা হয় সাধনা। ভারতবাসী আধ্যাত্মিক প্রকৃতির। তাই তাঁদের সাধনার লক্ষ্য পারমার্থিক সিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষলাভ।

ভারতীয় মানস স্থায়ী সুখের সন্ধানী। যথার্থ স্থায়ী সুখ কি এবং কেমন করে তা পেতে হয় তা জানার জন্য সাধনার প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই সাধনার ফসল হ’ল সাধনা প্রবন্ধমালার প্রতিটি প্রবন্ধ। এগুলি হল এক সাধকের উপলব্ধি। ভারববর্ষের অধ্যাত্ম জগতের গভীর সব মর্মবাণী প্রকাশিত হয়েছে সাধনা গ্রন্থের প্রতিটি প্রবন্ধে। সেই মর্মবাণীর মূল সুর প্রেথিত উপনিষদে। উপনিষদ বলে ভূমাতেই প্রকৃত সুখ। ভূমা ব্রহ্ম, ভূমা আত্মা। স্থায়ী সুখ বলতে বোঝায় ব্রহ্মোপলব্ধি, অপরোক্ষ আত্মেপলব্ধি এবং সেই অপরোক্ষ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের জন্য প্রয়োজন সাধনা।

সাধনা প্রবন্ধমালার প্রবন্ধগুলির মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন প্রাচীন ভারতীয় ঋষিরা কিভাবে নিজ চেতনাকে সম্প্রসারিত করে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে অনুসুৎত সর্বব্যাপী সুত্যকে উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাকেই আবার নিজের অন্তরাত্মা রূপে উপলব্ধি করে। বন্ধন মুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু এই উপলব্ধির পথে অজ্ঞানতা কিভাবে বাধা সৃষ্টি করে এবং অবিদ্যা কিভাবে মানুষকে নিজের ক্ষুদ্র সত্তার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে যে বিষয়েও তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু মানুষের ক্ষুদ্র ব্যক্তিসত্তা যতই তাকে আত্মকেন্দ্রিক করুক মানুষের নিজের মধ্যেই যেহেতু সীমাকে অতিক্রম করে যাওয়ার ধারণা আছে, অসীমের উপলব্ধির আকাঙ্খা আছে তাই একটা সময় মানুষ উপলব্ধি করে তার সত্তার অর্থ বিচ্ছেদের মধ্যে নেই, আছে ঐক্যের নিরবচ্ছিন্ন উপলব্ধিতে। ব্যক্তি আমি যখন পরিপূর্ণতা লাভ করে শাশ্বত আমির মধ্যে তখনই অবিদ্যার বন্ধন থেকে হয় তার মুক্তি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সাধনা' প্রবন্ধমালার প্রবন্ধগুলি শেষ পর্যন্ত পাঠককে অধ্যাত্মজগতের সেই পরম গন্তব্যে পৌঁছে দেয় যেখানে প্রেমের অপরোক্ষ উপলব্ধি দিয়ে সাধক নিজ অন্তরাত্মায় পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন। উপলব্ধি করেন ব্রহ্ম তার মধ্যে বিরাজিত আর তিনি ব্রহ্মের মধ্যে। সেখানেই সাধকের আধ্যাত্মিক সিদ্ধি। সেই দিক থেকে বিচার করলে 'সাধনা' গ্রন্থেয় সাধনা নামকরণটি অবশ্যই সার্থক।

Semester-6, DSE-4

‘সাধনা’ গ্রন্থের Problem of Self প্রবন্ধে ধর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘সাধনা’ প্রবন্ধমালার ব্যক্তি সত্তার সমস্যা প্রবন্ধে ‘ধর্ম’ বলতে বুঝিয়েছেন সবকিছুর অন্তরতম স্বরূপ বা অন্তর্নিহিত সত্যকে। যেমন বীজের স্বভাব খোলার মধ্যে ঢাকা থাকা। কিন্তু বীজের এই বাহ্য রূপ তার প্রকৃত স্বরূপের বিপরীত। খোলার আবরণ ভেঙেঁ নিজেকে অঙ্কুরে রূপান্তরিত করে ডালপালা মেলা গাছে পরিণত হওয়া তার ধর্ম।যদি বীজ নষ্ট হয়ে যায় বা মাটিতে পড়ে পচে যায় তার অর্থ বীজ তার প্রকৃত স্বরূপের সার্থকতালাভে ব্যর্থ হয়েছে।

ঠিক তেমনি মানুষের সত্তায় যে চরম উদ্দেশ্য কাজ ক’রে চলেছে তাই হ’ল মানুষের ধর্ম। এই ধর্ম হ’ল সহজাত, আপাতপ্রতীয়মান কিছু নয়। অবিদ্যার আবরণ উন্মোচন করে প্রাণশক্তিপূর্ণ আধ্যাত্মিকতার অঙ্কুরে নিজেদের রূপান্তরিত করা ও সব দিকে বিস্তার লাভ করাই মানুষের ধর্ম। মানুষের উন্নত প্রকৃতি সর্বদা এমন কিছুর সন্ধান করে যা তাকে অতিক্রম করে থাকে এবং তৎসত্ত্বেও যা নিগূঢ় সত্য। মানব সত্তাকে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে। একটি সত্তা নিজেকে প্রদর্শন করে। মানুষকে ভাবতে শেখায় নিজের মধ্যেই তার নিজের সত্তার পরিসমাপ্তি। আরেকটি সত্তা নিজের সীমা অতিক্রম করে যায় এবং তার ফলে নিজের প্রকৃত তাৎপর্য উদ্ঘাটন করে। এই সীমা অতিক্রম করার ধারণা তার নিজের মধ্যেই থাকে কারণ অগ্রসর হওয়া এর নিজের স্বভাব। তাই সত্তার যে দৃঢ় মুষ্টি তাকে বন্দী করে রেখেছে তার থেকে যখন সে নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয় তখনই সে তার যথার্থ স্বরূপে পৌঁছাতে পারে, তার ধর্মকে লাভ করে। ধর্মের কাজ স্বরূপকে বিনাশ না করে তাকে পরিপূর্ণ করে তোলা। মানুষ যখন সত্তার প্রকৃত অর্থ জানে তখনই সে তার ধর্মকে জানে। এই ধর্ম এতটাই সহজাত যে তা প্রকাশের জন্য মানুষ নিজের যা কিছু আছে দিয়ে দেয় আর কুঁড়ি থেকে ফুটে ওঠা ফুলের মত পূর্ণ হয়ে নিজের সৌন্দর্যের পেয়ালা থেকে সমস্ত মাধুর্য উজাড় ক’রে দেয়।

Semester-6, DSE-3

'সাধনা' গ্রন্থের Problem of Self প্রবন্ধে ব্যক্তি-আত্মা সংশ্লিষ্ট সমস্যার আলোচনা

'সাধনা' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন মানবাত্মাকে দুটি দৃষ্টিভঙ্গীঁ থেকে দেখা যেতে পারে ব্যক্তি-আত্মা এবং সমন্বিত আত্মা। ব্যক্তি-আত্মা নিজেকে প্রদর্শন করে এবং নিজেকে প্রদর্শন করার জন্য সে বড় হ'তে চেষ্টা করে। নিজের স্তূপীকৃত সম্পদের বেদীর ওপর উঠে দাঁড়ানো চেষ্টা করে এবং সবকিছু নিজের অধিকারে রাখার চেষ্টা করে। অবিদ্যা আমাদের চিন্তা করতে শেখায় যে আমাদের সত্তা, সত্তা রূপে সত্য। তার সম্পূর্ণ অর্থ রয়েছে তার নিজের মধ্যে। যখন আমরা এই ভ্রান্ত মত গ্রহণ করি, তখন এমনভাবে জীবন যাপন করার চেষ্টা করি যাতে আমাদের ব্যক্তি-আত্মা আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্যে পরিণত হয়। সসীমরূপে ব্যক্তি-আত্মা নিজের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সচেতন থাকে ও নির্দয়ভাবে সেখানে অন্যের থেকে অনেক বেশী সম্মান লাভের চেষ্টা করে। এবং এই কাজ করতেগিয়ে সে মূল্যহীন হয়ে যায়। ব্যক্তি-আত্মার এই বিচ্ছিন্নতাকে দার্শনিকেরা মায়া বলেছেন। মায়া মিথ্যা। মানবাত্মাকে ধরে রাখার কোনো উপায় ব্যক্তি-আত্মার নেই কারণ অগ্রসর হওয়া এর নিজের স্বভাব এবং এখানেই সে তার অস্তিত্বের এক মেরুতে গাছের গুড়ির সঙ্গেঁ এক হয়ে ও স্বতন্ত্র। অবিদ্যা যখন দূর হয়, যখন যথার্থ জ্ঞানের উদয় হয় তখন স্বতন্ত্র ব্যক্তি-আত্মার মধ্যে দিয়ে মানবাত্মার উত্তরণ যে অভীষ্ট লাভে হয় তা হল সমন্বিত আত্মা। মানবাত্মায় যে চরম উদ্দেশ্য কাজ ক'রে চলে তা হল এই সমন্বিত আত্মায় উত্তরণ।কিন্তু যতক্ষণ ব্যক্তি আত্মার দৃঢ়মুষ্টি থেকে মানাবাত্মা নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম না হয় ততক্ষণ সে তার স্বরূপের সার্থকতা লাভে ব্যর্থ হয়। এটি ব্যক্তি-আত্মার সমস্যা। মানুষের উন্নতপ্রকৃতি সর্বদা এমন কিছুর অনুসন্ধান করে চলে যা তাকে অতিক্রম করে থাকে কিন্তু তৎসত্বেও যা তার নিগূঢ় সত্য। কিন্তু যতক্ষণ সে অবিদ্যা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে না পারে ততক্ষণ সে নিজের যথার্থ স্বরূপে পৌঁছাতে পারে না। মানবাত্মা যেখানে ব্যক্তিমাত্র ও সসীম, যেখানে সে তার স্বাতন্ত্র্যকে চরম বলে মনে করে, সেখানে সে মায়া;আর যেখানে বিশ্বজনীনতার মধ্যে, অসীমের মধ্যে,পরমাত্মনের মধ্যে তার স্বরূপের প্রত্যভিজ্ঞা হয় সেখানে সে সত্য।

Semester-6, DSE-3

'সাধনা' গ্রন্থের Problem of Self প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সমস্যা বলতে কি বুঝিয়েছেন

মানবাত্মা যেখানে ব্যক্তিমাত্র ও সসীম সেখানে সে তার স্বাতন্ত্র্যকে চরম বলে মনে করে, অথচ ব্যক্তি আত্মার দৃঢ় মুষ্টি থেকে মানবাত্মা যতক্ষণ নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম না হয় ততক্ষণ সে তার স্বরূপের সার্থকতা লাভে ব্যর্থ হয়- 'ব্যক্তি সত্তার সমস্যা' প্রবন্ধে সমস্যা বলতে রবীন্দ্রনাথ এই সমস্যাকেই বুঝিয়েছেন।

সাধনা গ্রন্থের 'ব্যক্তিসত্তার সমস্যা প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন আমাদের সত্তাকে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে। একটি সত্তা নিজেকে প্রদর্শন করে, আরেকটি সত্তা নিজের সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং তারফলে নিজের প্রকৃ'ত তাৎপর্য উদ্ঘাটন। নিজেকে প্রদর্শন করার জন্য সে বড় হ'তে চেষ্টা করে, নিজের স্তূপীকৃত সম্পদের বেদীর ওপর উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে এবং সব কিছু নিজের অধিকারে রাখার চেষ্টা করে। অপর

দিকে নিজেকে প্রকাশ করার জন্য সে নিজের যা কিছু আছে বিলিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন মানব সত্তা হ'ল প্রদীপের মত। যতক্ষণ সে তার সম্পত্তি জমা রাখে ততক্ষণ সে নিজেকে অন্ধকারে রাখে। কিন্তু যখন সে আলোর সন্ধান পায় তখন নিজেকে ভুলে গিয়ে নিজের যা কিছু আছে সবটুকু উজাড় করে দিতে দ্বিধা করে না কারণ সেখানেই তার স্বরূপের প্রকাশ।

অবিদ্যা আমাদের চিন্তা করতে শেখায় যে আমাদের সত্তা, সত্তা রূপে সত্য। তার সম্পূর্ণ অর্থ রয়েছে তার নিজের মধ্যে। যখন আমরা সত্তা সম্বন্ধে এই ভ্রান্ত মত গ্রহণ করি, তখন এমনভাবে জীবন যাপন করার চেষ্টা করি যাতে আমাদের সত্তা আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্যে পরিণত হয়, অবিদ্যা আমাদের সত্তাকে বন্ধনে পরিণত করে, বুঝতে দেয় না তার নিজের মধ্যেই নিজের সীমাকে অতিক্রম করার ক্ষমতা রয়েছে। অগ্রসর হওয়া এর নিজের স্বভাব। অবিদ্যার কারণে সসীম ব্যক্তি সত্ত নিজের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে সচেতন হতে গিয়ে নিজে সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং এইভাবে নিজেকে মূল্যহীন করে ফেলে। এই বিচ্ছিন্ন সসীম ব্যক্তি সত্তাকে এইভাবে দার্শনিকেরা মায়া বা মিথ্যা বলে উল্লেখ করেছেন।

অবিদ্যা আবরণ দূর হলে এই সত্তাই আমাদের কাছে অমূল্য সম্পদ নিয়ে আসে। নিজেকে অমৃত রূপে প্রকাশ করে। অজ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা অপসারিত হয়ে আমাদের দৃষ্টি উন্মীলিত হলে আমরা আমাদের যথার্থ স্বরূপে পৌঁছাতে পারি। আমরা জানতে পারি আমাদের সত্তার অর্থ বিচ্ছেদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় যোগ বা ঐক্যের নিরবচ্ছিন্ন উপলব্ধিতে। তখন স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার মধ্যে দিয়ে মানবাত্মার উত্তরণ যে অভীষ্ট লাভে হয় তা হল সমন্বিত আত্মা। মানবাত্মায় যে চরম উদ্দেশ্য কাজ করে চলে তা হ'ল এই সমন্বিত আত্মায় উত্তরণ। যতক্ষণ সে নিজেকে অন্ধকারে রাখে ততক্ষণ তার আচরণ হয় এই উদ্দেশ্যে বিরোধী। কিন্তু যখন সে আলো খুঁজে পায় তখইবন মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে ভুলে যায় এবং নিজের যা কিছু আছে সবটুকু উজাড় করে দিয়ে সেই আলোকে উর্দ্ধে তোলে ও তার পরিচর্যা করে, কারণ সেখানেই তার প্রকাশ, তার স্বরূপের সার্থকতা।

কিন্তু সসীম ব্যক্তিসত্তার যে দৃঢ়মুষ্টি মানবাত্মাকে বন্দী রাখে তার থেকে নিজেকে মুক্ত না করা পর্য্যন্ত মানবাত্মা তার প্রকৃত স্বরূপ লাভ করতেপারে না। এই মুক্তির জন্য প্রয়োজন আত্মত্যাগ। মানুষের উন্নত প্রকৃতি সর্বদা এমন কিছু অনুসন্ধান করছে যা তাকে অতিক্রম করে থাকে এবং তৎসত্ত্বেও যা নিগূঢ় সত্য। কিন্তু সেই সত্য সে, আবার দাবী করে সমস্ত ত্যাগ। যদিও সেই ত্যাগকে সে, আবার তোলে নিজের ক্ষতিপূরণ। তাই তো রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সমস্ত সমস্যা কাটিয়ে মানবাত্মা হল এই ত্যাগকে পূজাবেদীতে নিয়ে যাওয়ার তরণী।

Semester-6, DSE-3

“সাধনা” গ্রন্থের Problem of Self প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুভাবনা

“সাধনা” গ্রন্থের ‘ব্যক্তিসত্তার সমস্যা’ শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন মানবসত্তা ঈশ্বরের আনন্দ রূপ হওয়ায় তা অমর। উপনিষদের ঋষি বলেন, “এই ভূত সকল আনন্দের থেকে জাত হয়,আনন্দের মধ্যে জীবিত থাকে, আনন্দের দিকে অগ্রসর হয় ও আনন্দের মধ্যে প্রবেশ করে।” এই আনন্দ হল শাশ্বত, চিরন্তন। মানুষের মধ্যে অমরত্ব সম্বন্ধে এই বোধ থাকায় মানুষ মৃত্যু সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়ে পড়ে যদিও মৃত্যুর বাস্তবকতাকে সে অস্বীকার পারে না। মৃত্যু সম্পর্কে নিজের ভাবনা ব্যক্ত করতে গিয়ে এই প্রসঙ্গেঁ রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, নিজেদের ভিতরের এই বিপরীতভাবকে মিলিয়ে দিয়ে মানুষ, এই সত্যে উপনীত হয়েছে যে, জীবন-মৃত্যুর এই দ্বৈততার মধ্যে রয়েছে এক সামঞ্জস্য। আত্মার জীবনে রয়েছে সীমার প্রকাশ এবং তার মূলতত্ত্ব রয়েছে অসীমে। তাই মৃত্যুর দরজা পেরোতে না পারলে জীবন অসীমকে উপলব্ধি করতে পারবে না। মৃত্যু অদ্বিতীয়, তার মধ্যে জীবন নেই। কিন্তু জীবনের মধ্যে রয়েছে দ্বিত্ব। তার বাহ্যরূপ ছাড়াও রয়েছে সত্যরূপ। মৃত্যু হল জীবনের বাহ্যরূপ বা মায়া যা জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। মানব সত্তাকে প্রাণময় থাকতে হলে ক্রমাগত পরিবর্তন ও রূপের বিকাশের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। আমরা যখন সত্তাকে কোন পরিবর্তনহীন আকার দিতে চাই বা মানবসত্তা যখন নিজেকে অতিক্রম করার কোন প্রেরণা অনুভব করে না, যখন সে নিজে সসীমতাকে চরম লক্ষ্য ধরে নিয়ে সেইমত আচরণ করে রবীন্দ্রনাথের মতে তখনই মানুষ মৃত্যু বরণ করে। ঠিক তখনই এই মৃত্যুতে মৃত্যুর জন্য তার কাছে আসে গুরুর আহ্বান। এই আহ্বান হল অনন্ত জীবনের আহ্বান। তার স্বরূপের মধ্যে যে অন্তরতম ইচ্ছা রয়েছে তাকে সচেতন ভাবে রূপায়িত করার জন্য গুরু এই ডাক পাঠান। জীবন হল মৃত্যুহীন তরুণ। মৃত্যু জীবনে থাকে না কিন্তু ছায়া যেমন প্রদীপকে অণুসরণ করে তেমনি মৃত্যু ও জীবনকে অণুসরণ করে। জীবনকে নিত্যনতুন করে তোলার জন্যই তাকে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। মৃত্যু আসলে হল পুরাতনের নূতনে রূপান্তর। মানবাত্মার অন্তরের অন্তরতম স্থলে দাঁড়িয়ে রয়েছে মৃত্যুহীন যৌবন। মৃত্যু ও ক্ষয় তার মুখের ওপর ক্ষনিকের ছায়া ফেলে ও এগিয়ে যায়, কোন পদচিহ্ন রেখে যায় না। সমন্বিত আত্মা থেকে যায় সজীব ও তরুণ।

Semester-6, DSE-3

‘ভারতবর্ষে সত্তার বিলোপকে কি মানুষ্যত্বের চরম লক্ষ্য বলে ধরা হয় নি’- এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিমত

“সাধনা” গ্রন্থের ‘ব্যক্তিসত্তার সমস্যা’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন এক শ্রোতার তাঁর কাছে প্রশ্ন ছিল “ভারতবর্ষের সত্তার বিলোপকে কি মনুষ্যত্বের চরম লক্ষ্য বলে ধরা হয় নি।

এই প্রশ্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন আমাদের শ্রেষ্ঠ ঋষিদের শিক্ষাকে নিজেদের জীবনে উপলব্ধি না করে শুধুমাত্র কতগুলি শব্দ অণুসরণ করে আমরা তাকে যখন বোঝার চেষ্টা করি তখন তাঁদের উপদেশের সঠিক তাৎপর্য্য ধরতে না পেরে আমরা তার ভুল ব্যাখ্যা করি। চিন্তা যত গভীর হয় তত তার শব্দগুলিকে জীবনের প্রেক্ষিত থেকে করতে হয়। শুধুমাত্র শব্দকোষের সাহায্যে তার অর্থ জানার চেষ্টা করলে প্রকৃত অর্থ অধরা থেকে যায়। তিনি আরো বলেছেন, বৌদ্ধ, ভারতীয়, এমনকি খ্রীষ্ট ধর্মেও নিঃস্বার্থ হওয়ার ওপর জোড় দেওয়া হয়, কিন্তু সেখানে কখনই আত্মবিলুপ্তির কথা বলা যায় না। ভারতীয় ভাবনায় যা নেতিবাচক এবং যা সত্যদর্শনে আমাদের বাধা দেয় তার বিলোপের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু যা ইতিবাচক ও অকৃত্রিম তার বিনাশ নেই। সেখানে বলা হয়েছে ব্যক্তিসত্তাকে সত্য হিসেবে ভেবে নেওয়া আমাদের অজ্ঞাত। এবং যখন মানুষ ব্যক্তিসত্তাকে সত্য হিসাবে ভেবে নেয় তখন সে এমনভাবে বাঁচে যে ব্যক্তিসত্তা হয়ে ওঠে তার জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য বস্তু। অবিদ্যা যখন মানুষকে এভাবে চিন্তা করতে বাধ্য করে তখন তার মধ্যে সীমাকে অতিক্রম করে যাওয়ার যে প্রবণতা আছে তাকে সে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু মানুষের সত্তা কখন একই পরিস্থিতিতে আবদ্ধ থাকে না কারণ এগিয়ে চলাই হচ্ছে তার স্বভাব। ব্যক্তি সত্তার শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তিপেতে মানুষ অবিদ্যাকে দূর করতে বাধ্য। অবিদ্যার প্রতিবন্ধকতা অপসারিত হলে মানুষের মন তার অন্তর্ব্যাপ্ত ভাবনার জগতে মুক্তি পায়। পূর্ণজ্ঞান লাভ করলে ঋষির উপদেশের প্রতিটি শব্দ সে যথার্থ ভাবে উপলব্ধি করে। তখন সে বোঝে আত্মবোধের অর্থ হচ্ছে আমাদের আত্মাকে যথার্থ স্বরূপে জেনে মুক্তি লাভ করা। আমাদের স্বরূপকে বিনাশ না করে পরিপূর্ণ করা। মানুষের উন্নত প্রকৃতি সর্বদা এমন কিছুর অনুসন্ধান করে চলেছে যা তাকে অতিক্রম করে থাকে তৎসত্ত্বেও যা নিগূঢ় সত্য, যা তার সমস্ত ত্যাগ দাবী করে। তৎসত্ত্বেও এই ত্যাগকেই ক্ষতিপূরণ করে তোলে। যে জীবন সত্য নয় তার থেকে মানুষের মুক্তির জন খ্রীষ্ট ধর্মে মৃত্যুর প্রতীক, বৌদ্ধ ধর্মে প্রদীপ নির্বাপণের প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে। মানবসত্তা প্রদীপেরমত। যে জীবন সত্য নয় তাকে আঁকড়ে যতক্ষণ সে বাঁচে ততক্ষণ সে নিজেকে অন্ধকারে রাখে, তার আচরণ তার প্রকৃত উদ্দেশ্যের বিরোধী হয়। যখন সে আলো খুঁজে পায় তখন মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে ভুলে যায়, আলোকে ঊর্দ্ধে তোলে ও নিজের যা কিছু আছে সব দিয়ে তার পরিচর্যা করে, কারণ সেখানেই তার প্রকাশ। এই প্রকাশে আসে মুক্তি। সুতরাং ব্যক্তিসত্তার বিলোপ হ’ল সেই সত্তার বিলোপ যা আমাদের ভাবতে শেখায় আমাদের সত্তা, সত্তারূপে সত্য, তার সম্পূর্ণ অর্থ রয়েছে তার নিজের মধ্যে।

'শুদ্ধ প্রেমের মধ্যেই আমরা চিত্তের মুক্তি লাভ করি'- রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে আলোচনা।

সাধনা গ্রন্থের 'ব্যক্তিসত্তার সমস্যা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন আমাদের সত্তা প্রদীপের মত। যতক্ষণ সে তার সম্পত্তি জমা করে, ততক্ষণ সে নিজেকে অন্ধকারে রাখে। তার আচরণ তার প্রকৃত উদ্দেশ্যের বিরোধী হয়। তার প্রকৃত উদ্দেশ্য হ'ল স্বরূপের সার্থকতা লাভ। কিন্তু যখন সে আলো খুঁজে পায় তখন মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে ভুলে যায়, নিজেরে ক্ষুদ্র ব্যক্তিসত্তার বেষ্টনীর বাইরে এসে নিজেরে যা কিছু আছে সবটুকু দিয়ে সেই আলোর পরিচর্যা করে, তাকে উর্দ্ধে তোলে, কারণ সেখানেই তার প্রকাশ। কিন্তু এই ত্যাগের পেছনে কোন স্বার্থপরতা থাকে না। কারণ স্বার্থপর ত্যাগ ব্যক্তি করে বাধ্য হয়ে। কিন্তু এই ত্যাগের মূলে থাকে বিশুদ্ধ প্রেম। স্বার্থপর বাসনার আকর্ষণে আমাদের যা কিছু আছে তাকে আমরা সহজে দূরে ঠেলে দিতে পারিনা, আমরা ভাবি এগুলো সবই আমাদের স্বরূপে আছে এবং এদের আলাদা করলে আমাদের রক্তক্ষরণ হয়। কিন্তু বিশুদ্ধ প্রেম যখন আমাদের অধিকার করে তখন অন্তরঙ্গভাবে যা কিছু আমাদের সঙ্গেঁ লিপ্ত ছিল সেগুলো তাদের অন্তরঙ্গঁতা ও গুরুত্ব হারায়। এবং আমরা উপলব্ধি করি সেগুলির কোনটিই আমাদের নয়। তখন তাদের পরিত্যাগ করার মধ্যে ক্ষতির বদলে আমরা দেখি আমাদের স্বরূপের পূর্ণতা। বাকি সব কিছু সম্পর্কে আমাদের মনে 'কেন' প্রশ্ন জাগলে ও প্রেমে 'কেন'র কোন স্থান থাকে না। প্রেম নিজেই নিজের উত্তর, নিজেই নিজের পরিণাম।

ভালোবেসে ত্যাগ হল গাছের পাকা ফল সমর্পনের মত আনন্দের বিষয়। কারণ প্রেমের বশবর্তী হয়ে যা করা হয় তা স্বাধীন ভাবে করা হয়, বাসনা বা ভয়ের বাধ্যবাধকতা থেকে নয়। প্রেমের বিস্তারের মধ্যে দিয়েই স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার উত্তরণ যে অভীষ্ট লাভে হয় তা হল সমন্বিত আত্মা। আমাদের সত্তার প্রকৃত অর্থ যে ঈশ্বর ও অন্য সকলের থেকে বিচ্ছেদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় ঐক্যের নিরবচ্ছিন্ন উপলব্ধিতে- এই সত্য উপলব্ধির নামই হ'ল মুক্তি সেইকারণে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'শুদ্ধ' প্রেমের মধ্যেই আমরা চিত্তের মুক্তি লাভ করি।